শার্লক হোমস, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার
ও মঙ্গলগ্রহ
অদ্রীশ বর্ধন

শার্লক হোমস, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ও মঙ্গলগ্রহ

শার্লক হোমস, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ও মঙ্গলগ্রহ

অদ্রীশ বর্ধন

ম্যানলি ওয়েড ওয়েলম্যান এবং ওয়েড ওয়েলম্যান বিরচিত 'শার্লক হোমস'স ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস' উপন্যাসের ভাবানুবাদ

ফ্যানট্যাস্টিক ও কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস
যৌথ প্রয়াস

আদরের নাতনি
জয়িতা শীল-কে

লেখকের কথা

‘শার্লক হোমস, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ও মঙ্গলগ্রহ’ উপন্যাসটি আমার প্রয়াত বন্ধুবর শ্রী রবীন বলের অনুপ্রেরণায় লেখা। ওঁর কথা ফেলতে পারতাম না বলেই আমার এই কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস লেখা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পাতায় প্রায় পঁচিশ বছর আগে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রচুর কল্পবিজ্ঞানের গল্প, উপন্যাস লিখেছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু সেদিনের এই লেখার মজাই ছিল আলাদা। কারণ এটা ছিল আমার প্রথম জীবনের কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস। বর্তমান প্রজন্মের পাঠকের ভালো লাগবে এই আশা রাখি।

অদ্রীশ বর্ধন

কলকাতা

২ ডিসেম্বর, ২০০৬

মুখবন্ধ

স্যার আর্থার কন্যান ডয়াল এবং হারবার্ট জর্জ ওয়েলস ইংরেজি গোয়েন্দা এবং সায়েন্স ফিকশন সাহিত্যের দুই দিকপাল। স্যার ডয়াল সৃষ্টি করে গেছেন অমর গোয়েন্দা শার্লক হোমস এবং অমর বৈজ্ঞানিক প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে। ওয়েলস তাঁর সুবিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস 'দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন পিয়ারসনস ম্যাগাজিনে ১৮৯৭ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাসে— বইটি প্রকাশ পায় ১৮৯৮ সালের জানুয়ারিতে।

১৯০২ সালের জুন মাসে পৃথিবীর খুব কাছে এসেছিল মঙ্গলগ্রহ এবং ওয়েলস কল্পনা করেন সেই সময়েই লালগ্রহের ভয়ংকররা দানবিক আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছিল অভাগা গ্রহ এই পৃথিবীর ওপরে। শৌর্যেবীর্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে অহংকৃত এবং সমুন্নত মানুষ হেরে গিয়েছিল তাদের কাছে— হারেনি কিন্তু তারাই, যাদের চোখে দেখা যায় না— যারা ছড়িয়ে রয়েছে এই পৃথিবীর সর্বত্র— জীবাণুরা।

হোমস এবং চ্যালেঞ্জার কিন্তু আগেই জেনেছিলেন পৃথিবীতে হানা দিতে আসছে মঙ্গলগ্রহীরা। তারপর কী কী ঘটেছিল, তা-ই নিয়েই বিস্ময়কর এই রোমাঞ্চ কাহিনি। বিশ্বের বিখ্যাত দুই চরিত্র হোমস এবং চ্যালেঞ্জার বিশ্বের বিখ্যাত কাহিনি 'দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস'-এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন কীভাবে— তা-ই নিয়েই এই চাঞ্চল্যকর এবং লোমহর্ষক উপাখ্যান। ওয়েলস যা কল্পনাও করেননি কিন্তু পরবর্তীকালে ওদেশের বহু সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক যা নিয়ে ভেবেছিলেন এবং ভাবনার বীজ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও চিঠিপত্রে রোপণ করে গিয়েছিলেন, তা-ই নিয়েই রচিত অতিবিচিত্র এবং অতি-অবিশ্বাস্য এই অতি-কাহিনি ছোটবড় সব্বাইকে রুদ্ধশ্বাসে রাখবে প্রথম পংক্তি থেকে শেষ পংক্তি পর্যন্ত।

অলীক চরিত্র হোমসকে নিয়ে বাস্তব রহস্যভেদের চেষ্টা এর আগে হয়েছে 'এ স্টাডি ইন টেরর' ছায়াছবিতে। ছবিটি লন্ডন শহরে মুক্তি পায় ১৮৯০ সাল নাগাদ এবং তাতে দেখানো হয় চিররহস্যাবৃত ভয়াল ভয়ংকর জ্যাক দ্য রিপারকে কীভাবে এক হাত নিয়েছেন শার্লক হোমস। কিন্তু হোমসকে মঙ্গলগ্রহীদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে অভিনবত্ব আছে বইকী। এই অভিনবত্বের প্রথম সন্ধান দেন সুবিখ্যাত সাংবাদিক স্যার

এডওয়ার্ড ডান ম্যালোন তাঁর বিভিন্ন অপ্রকাশিত চিঠিপত্র এবং ছদ্মনামে প্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে। এই বইটি ম্যানলি ওয়েড ওয়েলম্যান এবং তাঁর পুত্র ওয়েড ওয়েলম্যানের লেখা 'শার্লক হোমস'স ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস' উপন্যাসের ভাবানুবাদ।

ক্রিস্টাল ডিম প্রহেলিকা

লন্ডন শহরের গ্রেট পোর্টল্যান্ড স্ট্রিটের যে দোকানটি কারওরই নজর কাড়তে পারে না, দীনহীন সেই দোকানেই শুরু হচ্ছে বিচিত্র এই কাহিনি।

সামনের দরজাটা বেশ মজবুত। লোহার পাত মারা। সাইনবোর্ডে লেখা শিল্পদ্রব্য এবং সুপ্রাচীন দ্রব্য। দুটো ছোট জানালায় পুরু কাচ। একটার কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা কার্ড। তাতে লেখা :

দুষ্প্রাপ্য বস্তুসমুদয়ের কেনাবেচা হয়

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লেখাটির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল দীর্ঘকায় পুরুষটি। পরনে তার চেককাটা আলস্টার। পরক্ষণেই লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢুকল ভেতরে।

তখন বিকেল। ডিসেম্বরের কনকনে ঠান্ডায় হাড়সুদ্ধ যেন জমে যাচ্ছে।

ভেতরে আলোর চাইতে অন্ধকার বেশি। এককোণে ঢাকা দেওয়া একটা লম্ফ। তাকগুলোতে ঠাসা হাবিজাবি অনেক জিনিস। ফুলদানি, কাপ, পুরোনো বই। একটা টেবিলের ওপর ছড়ানো এমনি আরও টুকিটাকি জিনিস। ওপরে রাখা সাদা কার্ডে লেখা :

লম্বা লোকটা যেই ঝুঁকেছে টেবিলের ওপর, অমনি ভেতরের দরজা খুলে দোকানঘরে ঢুকল মালিক। মাথায় টাক।

'ইয়েস স্যার?'

'মি. বল্ডুইন, এক ভদ্রলোক এখুনি আসবেন এখানে। দেখা করব বলে এলাম। ভালো কথা,' টেবিলের ওপর ফের ঝুঁকে বাজপাখির চঞ্চুর মতো নাকখানা বাড়িয়ে বললে আগন্তুক, 'কী এগুলি?'

'পুরোনো জিনিস কেনাবেচা করতেন ম্যাকফারসন। মারা গেছেন সেই সেদিন। দোকান বিক্রি হয়ে যেতে কিছু জিনিস আমি কিনেছি।'

মুঠোর মতো বড়, ডিমের মতো দেখতে, সুন্দরভাবে পালিশ করা চকচকে একটা ক্রিস্টাল তুলে নিল আগন্তুক। লম্ফের আলোয় যেন নীল শিখা জ্বলে উঠল ভেতরে।

'দাম কত?'

'পাঁচ পাউন্ড।'

শীর্ণ সাদা হাতে ধূসর সুটের ভেতর পকেট থেকে পাঁচ পাউন্ডের একটা নোট বার করে এগিয়ে দিল আগন্তুক, 'থাক, প্যাক করার দরকার নেই।'

ক্রিস্টাল ডিম অন্তর্হিত হল আলস্টারের পকেটে। ঠিক সেই সময়ে দরজা দিয়ে দোকানঘরে ঢুকল আর এক খদ্দের। মাথায় খাটো। নোংরা। অবিন্যস্ত ধূসর চুল। ঢুকেই দাঁড়িয়ে গেল পায়ে পেরেক-আঁটা পুতুলের মতো। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল লম্বা লোকটার পানে।

পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল ষাঁড়ের মতো গলায়, 'বল্ডুইন, শার্লক হোমসকে ডেকে এনেছিস কী মতলবে?...'

লম্বা লোকটা বললে অশান্ত কণ্ঠে, 'কেউ ডাকেনি, নিজেই এসেছি। তোমার সঙ্গে দেখা করব বলেই এসেছি।'

আমতা আমতা করে বল্ডুইন বললে, 'ইনি শার্লক হোমস?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমিই শার্লক হোমস।' যেন বিনয়ের অবতার হয়ে গেল তালঢ্যাঙা শীর্ণ লোকটা, 'এসেছি হাডসনের সঙ্গে মোলাকাত করতে।'

'আমার সঙ্গে!' সিঁটিয়ে ওঠে নবাগত।

'মিস্টার স্যামুয়েল ফ্রিজের বিকিনি আংটিটা বেচতে আসবে এখানে, আঁচ করেই এসেছি। বার করো।' হাত বাড়িয়ে বললে হোমস।

বুক চিতিয়ে জবাব দিল হাডসন, 'ফ্রিজের আংটি আমি নিয়েছি, প্রমাণ করতে পারবেন?'

'প্রথমত, আংটিটা এই মুহূর্তে তোমার কড়ে আঙুলে শোভা পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আমার চ্যালাচামুন্ডারা প্রমাণ করে দেবে আংটি কীভাবে এসেছে ফ্রিজের কাছ থেকে তোমার আঙুলে। খোলো আংটি। নইলে চোরাই আংটি কেনার দায়ে বল্ডুইনকে ঝামেলায় ফেলব।'

মুখ লাল হয়ে গেল হাডসনের। আঙুল থেকে আংটি খুলে এগিয়ে দিয়ে বললে দাঁত কিড়মিড় করে, 'শয়তান কোথাকার!'

ওয়েস্টকোটের পকেটে আংটি চালান করে হোমস বললে নির্লিপ্ত স্বরে, 'তোমার কাছে কনসাল্টিং ডিটেকটিভ মাত্রই অবশ্য শয়তান।'

হাডসন জবাব দিল না। আরক্ত মুখে বল্ডুইনের পানে ফিরে বললে, 'ক্রিস্টাল ডিমটা গেল কোথায়? চার্লির কাছে শুনলাম তুমি কিনেছ?'

নির্লিপ্ত স্বরেই বললে হোমস, 'আমি আবার কিনেছি বল্ডুইনের কাছ থেকে। কিন্তু সৌন্দর্যের তুমি কী বোঝো হাডসন? ক্রিস্টাল ডিমের দিকে নজর পড়ল কেন?'

রেগে গেল হাডসন, 'বলব আপনার কেচ্ছাকাহিনি?'

'বলতে পারো। তোমারও কিছু কেচ্ছাকাহিনি পুলিশকে বলে আসা যাবে-খন। তবে তোমার মুখ বন্ধ থাকলে আমিও মুখ বন্ধ করে রাখব কথা দিচ্ছি।' বলেই, দোকানের বাইরে এল শার্লক হোমস।

পেছন পেছন ছুটে এল হাডসন। বরফ পড়ার মতো কনকনে ঠান্ডা রাস্তায়।

'মিস্টার হোমস, ক্রিস্টালটা আমাকে বিক্রি করুন।'

'হাডসন, তোমাকে শেষ ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি— ফের যদি এ-পাড়ায় তোমাকে দেখি— তোমার এই দোকানে পুলিশ ঢুকিয়ে ছাড়ব— তোমাকেও শ্রীঘরে ঢোকাব। গুড় বাই।' চলন্ত

ছ্যাকড়াগাড়ি দাঁড় করিয়ে টকাস করে উঠে পড়ল হোমস। গনগনে চোখে দাঁড়িয়ে রইল হাডসন।

গাড়ি এসে দাঁড়াল ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাছে স্যামুয়েল ফ্রিজের বাড়ির সামনে। নধরকান্তি ফ্রিজ তো আহ্লাদে আটখানা আংটি দেখে। আংটিটা অত্যন্ত পয়মন্ত। বাপঠাকুরদা এই আংটি পরিয়ে বউ এনেছে সংসারে— ফ্রিজেরও সেই পরিকল্পনা বানচাল হতে বসেছিল আংটি চুরি যাওয়ায়।

তাই একগাল হেসে হোমসের দক্ষিণা গুনে দিতে দিতে ফ্রিজ বললে, 'মাত্র বারো ঘণ্টার মধ্যে চোরাই মাল ফেরত এনে আবার আপনার সুনাম বজায় রাখলেন মিস্টার হোমস।'

শুষ্ক হেসে বিদায় নিল হোমস। এল বেকার স্ট্রিটের বাসায়। ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকল ছোকরা চাকর বিলিকে। এক মুঠো খুচরো তার হাতে গছিয়ে দিয়ে বললে মিষ্ট কণ্ঠে, 'বেকার স্ট্রিটের চ্যাংড়াবাহিনীকে বিলিয়ে দিয়ে আয় আংটি চোরের নাম বলে দেওয়ার জন্যে।'

আঁজলা পেতে খুচরো নিয়ে বিলি বললে, 'আরও খবর আছে। হাডসন বল্ডুইনের দোকানে আর যাবে না— অন্য দোকান খুঁজছে আপনার ভয়ে। বল্ডুইনকে বলছিল হাডসন নিজে।'

হাসল হোমস, 'প্রস্তাবটা আমারই, বিলি। শত্রুরাও তাহলে হোমসের কথা শুনছে আজকাল।'

বিদায় হল বিলি। হোমস আলস্টার খুলে ঝুলিয়ে রাখল আলনায়। পকেট থেকে ক্রিস্টাল ডিমটা বার করে এনে বসল চেয়ারে। ডিমটা ও কিনেছে ল্যান্ডলেডিকে বড়দিনে উপহার দেবে বলে। কিন্তু হোমসের খটকা লাগছে, এমন জিনিসে হাডসনের মতো চারশো বিশ লোকটার বেজায় আগ্রহ দেখে। কেন সে কিনতে চায় ক্রিস্টাল ডিম?

একাগ্র দৃষ্টি মেলে চকচকে ডিমটার দিকে চেয়ে রইল হোমস। আবার দেখল কুয়াশার মতো নীলচে অগ্নিশিখা— গোলাপি লাল আর উজ্জ্বল সোনা রং সরু সরু সুতোর আকারে যেন মিশে রয়েছে নীল অগ্নিশিখার সঙ্গে। ঝিলমিলিয়ে উঠছে বিচিত্র সেই রঙের খেলা— ক্রিস্টাল নাড়লে রঙের বাহার কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে।

উঠে দাঁড়াল হোমস। জানালার পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করে দিয়ে ফের এসে বসল টেবিলের সামনে ক্রিস্টালটাকে আরও খুঁটিয়ে দেখবে বলে।

আচম্বিতে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল শার্লক হোমসের পৃষ্ঠদেশের মধ্যে দিয়ে। উদগ্র উৎসাহে ঝুঁকে পড়ল ডিমের ওপর— নিরতিসীম উত্তেজনায় ঝকঝক করে উঠল হীরক-উজ্জ্বল দুই চক্ষু।

এ কী দেখছে শার্লক হোমস! নীল আলোটা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শুধু ঝকঝকেই হয়নি, যেন নড়ছে, ঢেউয়ের মতো আন্দোলিত হচ্ছে। জলের ঢেউ যেমন ছলছলিয়ে তরঙ্গাকারে বয়ে যায়— নীল আলোটাও যেন সেইভাবে তরঙ্গাকারে দুলছে, প্রবাহিত হচ্ছে। জল যেন বিক্ষুব্ধ। তরঙ্গও তাই উত্তাল... এ তরঙ্গ রঙের তরঙ্গ, ক্যালিডোস্কোপে যেমন অজস্র রঙের প্যাটার্ন আর ছুটোছুটি দেখা যায়... আশ্চর্য এই ক্রিস্টালেও তেমনি নীল রঙের সঙ্গে বিনুনি কেটে নক্ষত্রবেগে উধাও হয়ে যাচ্ছে সোনালি ডোরা লাল রশ্মি, এমনকী সবুজ দ্যুতিও। কখনও দেখা দিচ্ছে স্ফুলিঙ্গের মতো কখনও রশ্মিরেখার মতো। সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আরও একটা আশ্চর্য পরিবর্তন।

কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে আসছে।

ফিকে হয়ে যাওয়া কুয়াশার মধ্যে দিয়ে মুহূর্তের জন্যে হোমসের শাণিত চোখে ধরা পড়ল যেন বহুদূরের এক নিসর্গ দৃশ্য।

যেন অনেক উঁচু থেকে নীচের পানে চেয়ে রয়েছে হোমস। বহুদূর বিস্তৃত সমতলভূমির অনেক দূরে দৃষ্টিপথ ব্যাহত করে বিরাট বিরাট চাঁইয়ের মতো কী যেন মাথা ঠেলে উঠেছে আকাশপানে। টেরাকোটার মতো লাল তাদের বর্ণ। কাছের দিকে এবং প্রায় সরাসরি চোখের তলায় দেখা যাচ্ছে বিরাট একটা আয়তক্ষেত্র— গাঢ় রঙের মঞ্চ যেন। ডাইনে বাঁয়ে হালকা সবুজ মাঠের মতো কী যেন নজরে আসছে, তার পরেই লাল মাটি... বহুদূর বিস্তৃত। এক লহমায় এই পর্যন্ত দেখার পরেই চকিতে ফের আবির্ভূত হল কুয়াশার মতো নীল-কালো... মুছে দিল বিচিত্র নিসর্গদৃশ্যকে।

ঠিক এই সময়ে টুক টুক করে আলতো টোকা পড়ল দরজায়। ঝটিতে ক্রিস্টাল ডিমকে চেয়ারের তলায় আঁধার অঞ্চলে চালান করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল হোমস। দরজা খুলে ধরতেই দেখল মার্থা হাডসনকে— এ বাড়ির ল্যান্ডলেডি।

'খাবেন? ডক্টর ওয়াটসন থিয়েটারে গেছেন। আহারে বিলম্ব করতে নেই।'

হাসল হোমস। নেমে গেল মিসেস হাডসন। হোমস গিয়ে টেলিফোন পাকড়াও করে একটা নাম্বার চাইল।

অন্য তরফ থেকে সাড়া এল এই ভাবে:

'হ্যাল্লো!' মেঘগর্জন তুচ্ছ সেই কণ্ঠস্বরের কাছে।

'প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' হোমস বললে বিনীত কণ্ঠে।

'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার হাজির।' এবার যেন বজ্রপাত ঘটল কণ্ঠস্বরের মধ্যে। 'কিন্তু আপনি কোথাকার বে-আক্কেলে? কী মতলবে বিরক্ত করা হচ্ছে আমাকে?'

'আমি শার্লক হোমস।'

'আ!' কণ্ঠস্বর এবার যেন ফেটে পড়ল লক্ষ বজ্রের মিলিত বিস্ফোরণে। 'ভায়া হোমস, এত চড়া চড়া কথা বলার মোটেই ইচ্ছে ছিল না... কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে ছিলাম তো... ফোনটা আসতেই মেজাজটা ঠিক রাখতে পারিনি। তা ছাড়া খবরের কাগজের ওই সবজান্তা হাড়হাভাতে রিপোর্টারগুলো বড্ড জ্বালিয়ে মারছে আমাকে। বলো ভায়া বলো, কী সেবায় তোমার লাগতে পারি বলো।'

'অদ্ভুত একটা প্রহেলিকা নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু বসতে চাই।'

'প্রহেলিকা! অদ্ভুত প্রহেলিকা! নিশ্চয়... নিশ্চয়... যখন খুশি... যেভাবে খুশি আসতে পারো। লন্ডনের মুষ্টিমেয় যে ক-জনের সঙ্গে কথা বলে উপকৃত হওয়া যায় এবং মানসিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পেশার চরম শিখরে যারা উঠতে পেরেছে... তুমি তাদের অন্যতম। কাল সকালে আসবে?'

'সকাল দশটায় এলে চলবে?'

'আলবত চলবে। তাহলে ওই কথাই রইল।'

টেলিফোন ঝুলিয়ে রাখল হোমস। ট্রে-ভরতি খাবারদাবার নিয়ে ঢুকল মার্থা হাডসন।

ক্রিস্টাল ডিমে মঙ্গলগ্রহ

পরের দিন সকাল দশটায় ওয়েস্ট কেনসিংটনে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের নিবাস এনমোর পার্কে হাজির হল শার্লক হোমস। বিশাল গাড়িবারান্দাওয়ালা পেল্লায় অট্টালিকা। গৃহভৃত্য হোমসকে পৌঁছে দিল চ্যালেঞ্জারের ঘরের সামনে। দরজায় টোকা দিতেই হুংকার ভেসে এল ভেতর থেকে... 'ভেতরে আসা হোক।'

ভেতরে এল হোমস। মস্ত স্টাডিরুম। সারি সারি তাকে ঠাসা বৈজ্ঞানিক কেতাব আর যন্ত্রপাতি। বিরাট চওড়া টেবিলের সামনে বসে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। বৃষস্কন্ধ। খর্বাকায়। কুচকুচে কালো বাটালি মার্কা চাপদাড়ি... সুপ্রাচীন আসীরিয় (অসুর?) নৃপতিদের গণ্ডে যা শোভা পেত। লোমাবৃত প্রকাণ্ড এক হাতে যেন খামচে ধরে আছেন একটি লেখনী। ঝুলন্ত পর্দার মতো চোখের পাতার তলা দিয়ে নীল চোখ মেলে হোমসকে নিরীক্ষণ করলেন এ-হেন বিখ্যাত পুরুষটি।

'চোখ ধাঁধানো নতুন কোনও বৈজ্ঞানিক কাজে বাগড়া দিলাম না তো?' বললে হোমস।

'খসড়াটা প্রায় শেষ হয়ে এল,' বললেন চ্যালেঞ্জার। সেই সঙ্গে লেখনীটা প্রায় নিক্ষেপ করলেন টেবিলে। 'ভিয়েনা কনফারেন্সে বক্তৃতাটা পড়ব... অনেক তাত্ত্বিকের চোখ কপালে উঠবে, ভুরু কুঁচকে থাকবে। ইতিমধ্যে ঘণ্টাখানেক তোমার প্রহেলিকার পেছনে ব্যয় করা যাবে।'

'যেমনটা করেছিলেন মাটিলডা ব্রিগস আর সুমাত্রার দানব ইঁদুরদের পেছনে?'

'আরে দূর, সে তো দুষ্প্রাপ্য কয়েকটা নমুনাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সাজানোর ব্যাপার। বলো ভায়া, এবার কী ধাঁধা এনেছ।'

ক্রিস্টাল ডিম বার করল হোমস। বলল, গত সন্ধ্যায় কী দেখেছে ডিমের মধ্যে। প্রকাণ্ড থাবায় বিচিত্র বস্তুটি গ্রহণ করে ঝোপের মতো পুরু ভুরু কুঁচকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

তারপর বললেন কুঞ্চিত ললাটে, ‘সত্যিই ভেতরে একটা আভা দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারে সুবিধে হবে দেখতে। পর্দাটা টেনে দেবে, ভায়া?’

পর্দা টেনে দিয়ে ঘর প্রায় অন্ধকার করে দিল হোমস। চ্যালেঞ্জার বৃষস্কন্ধ চেয়ে রইলেন ক্রিস্টাল ডিমের পানে। ঘাড়ের ওপর দিয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টি মেলে ডিম্ব-প্রহেলিকায় তন্নিষ্ঠ হল শার্লক হোমস।

কিছুক্ষণ পরে মন্তব্য শোনা গেল চ্যালেঞ্জারের রাশভ কণ্ঠে, ‘কুয়াশা ঠিকই, কিন্তু আংশিক স্বচ্ছ। প্রায় তরল বলেই এমন নড়ছে, ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!’

বলতে বলতে ড্রয়ার থেকে একখণ্ড কৃষ্ণবস্ত্র বার করলেন প্রফেসর। ঘোমটার মতো মেলে ধরলেন ক্রিস্টাল ডিমের ওপর। এবার দেখা গেল, প্রায় স্বচ্ছ কুয়াশার নরম দ্যুতি আবার গলে গলে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে এবং গত রাতে দেখা অপার্থিব সেই নিসর্গদৃশ্য ফের আবির্ভূত হচ্ছে।

দূরবিন উলটো করে চোখে লাগালে সব দৃশ্য যেমন ছোট্ট অথচ নিখুঁতভাবে দেখা যায়, এবারের দৃশ্য দেখা গেল প্রায় সেইভাবে। বহুদূর বিস্তৃত ভূমি, অনেক দূরে লালচে-বাদামি রঙের বাঁধ, বাঁধের এদিকে নিম্নভূমির ওপর বিশাল চ্যাটালো ছাদের মতো আয়তক্ষেত্রের পর আয়তক্ষেত্র।

কী যেন সব নড়ছে এই সব আয়তক্ষেত্র এবং পাশের দিকের সবুজ ঘাসে ছাওয়া জমির ওপর। একদম সামনে সমান ব্যবধানে সাজানো সারবন্দি কতকগুলো সরু মাস্তুলের মতো সুউচ্চ খুঁটি... রোদ্দুর ঝকমকে বরফখণ্ডের উজ্জ্বল দ্যুতি ঠিকরে যাচ্ছে প্রতিটির ডগা থেকে।

হোমসের মতো নীরস কাঠখোট্টা মানুষও যেন কীরকম হয়ে গেল এই দৃশ্য দেখে, বলল আবেশ বিহ্বল কণ্ঠে, ‘বিউটিফুল! অপার্থিব!’

বিড়বিড় করে চ্যালেঞ্জার বললেন আপন মনে, ‘অপার্থিব তো বটেই। উপযুক্ত শব্দই ব্যবহার করেছ, ভায়া। এ দৃশ্য পৃথিবী নামক এই গ্রহের পৃষ্ঠে আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি... দেখবেও না।’

বিচিত্র সেই দৃশ্য মুহূর্তের মধ্যে কুয়াশাবৃত হয়েই পরিষ্কার হয়ে গেল পরক্ষণেই। সঞ্চরমান বস্তুগুলিকে এবার ঠাহর করা গেল মোটামুটি। জমির ওপর যারা নড়ছে, তাদের বলা উচিত বিশালাকার গুবরে পোকা। গুটিগুটি এগোচ্ছে শম্বুকগতিতে। ঝকঝক করছে গায়ের আঁশ। আয়তক্ষেত্রাকার ছাদের ওপর সঞ্চরমান বস্তুগুলি আরও কাছে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্রকায় এবং গোলাকার। নড়ছে এরাও। ইতস্তত। তারপর, একদম সামনে সিধে মাস্তুলের মতো খুঁটিগুলোর ফাঁক দিয়ে মথ পোকা অথবা বাদুরের মতো কী যেন উড়ে এল ডানা ঝটপটিয়ে। এগিয়ে এল অনেক নিকটে। পরমুহূর্তেই, আচম্বিতে, একটা মুখ উঁকি দিল ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে।

হোমসের নজর অতিশয় তীক্ষ্ণ বলেই এক লহমার মধ্যেই যা দেখবার দেখে নিল। দেখল, বড় বড় গোল গোল দুটো চোখ প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আছে তার পানে। শুধু তাকিয়ে আছে বললে কম বলা হবে, যেন চামড়া ফুঁড়ে ভেতর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে হোমসের।

পরের মুহূর্তেই অন্তর্হিত হল বৃহদাকার গোলাকার দুই চক্ষু... সেই সঙ্গে অদৃশ্য হল অপার্থিব নিসর্গ দৃশ্য... ঘুরপাক খেতে লাগল কেবল পুঞ্জ পুঞ্জ নীল কুহেলি।

ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো চেয়ার থেকে ছিটকে গেলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। সবলে জানলার পর্দা সরিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন বিদ্যুদ্‌বেগে।

বললেন মেঘমন্দ্র কণ্ঠে, 'হোমস, দেখেছ?'

শুষ্ক হেসে হোমস বললে, 'দেখেছি। যা দেখেছি তা লিখে আপনাকেদেখাচ্ছি। আপনি লিখে জানান কী দেখলেন। দেখি, দুজনের দেখা এক হয় কি না।'

চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল হোমস। ঝড়ের বেগে কলম চালাল কাগজে। প্রফেসরও বসলেন কাগজ পেনসিল নিয়ে। সমানে নাসিকাধ্বনি করতে করতে লিখে চললেন নক্ষত্রবেগে। সেকেন্ড কয়েক অখণ্ড নীরবতার পর কাগজ পালটাপালটি করলেন দুই কৃতবিদ্য পুরুষ। পড়লেন নিরুদ্ধ নিশ্বাসে।

তারপর কাগজ নামিয়ে রেখে আর একবার ঘোর নাসিকাধ্বনি করে বললেন প্রফেসর, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, যা দেখেছি, তা চোখের ভুল নয়... মরীচিকা দর্শন নয়। কেননা, দুজনেই দেখেছি একই দৃশ্য... একই বিস্ময়। বৈজ্ঞানিক বলেই আমার দর্শনেন্দ্রিয় বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখতে অভ্যস্ত ঠিকই, তবে গোয়েন্দা বলেই তুমি আর একটু খুঁটিয়ে

কতকগুলো তুচ্ছ কিন্তু অসাধারণ জিনিস দেখে ফেলেছ... ছাদ, দূরের বাঁধ। আর সঞ্চরমান জীবন্ত বস্তু। কিন্তু ক্রিস্টাল মহাপ্রভু এই যে অপার্থিব দৃশ্যটি দেখালেন, এবার সেই দৃশ্যের একটা যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যাক।'

হোমস বলে উঠল তক্ষুনি, 'আমার তো মনে হয় অন্য কোনও গ্রহের দৃশ্য।'

আশ্চর্য ক্রিস্টালকে দু-হাতে চোখের সামনে রেখে উলটেপালটে নিরীক্ষণ করতে করতে প্রফেসর বললেন, 'ভায়া তোমার সঙ্গে একমত হওয়ার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারছি না। অনেক সময়ে ছেলেভুলানো খেলনা ক্রিস্টালের মধ্যে আশ্চর্য মরীচিকা দৃশ্য ঢোকানো থাকে। এ যদি সে ধরনের খেলনাও হয়, তাহলেও বলব বাহাদুরি আছে বটে খেলনা প্রস্তুতকারকের।'

হোমস বললে, 'ক্রিস্টালকে নানান দিক থেকে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখা যাক পট পরিবর্তন ঘটে কি না।'

সেই পরীক্ষানিরীক্ষাই চলল কিছুক্ষণ ধরে। নানান কোণ থেকে নানানভাবে দৃষ্টিশর নিক্ষেপ করা হল অদ্ভুত ক্রিস্টালের মধ্যে। কখনও মনে হল দূরবিস্তৃত ছাদ আর আকাশচুম্বী মাস্তুল ছাড়াও যেন আরও কিছু চোখে পড়ছে... কিন্তু অতিশয় আবছাভাবে; কখনও পুঞ্জ পুঞ্জ নীলাভ কুয়াশা ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না।

এইভাবেই কিছুক্ষণ এক্সপেরিমেন্ট চালানোর পর হোমস বললে, 'নিরন্ধ্র অন্ধকার হলে কি ভালো দেখা যাবে বলে মনে হয়?'

'সম্ভাবনাটা আমার মাথাতেও এসেছে,' যেন নাভির মধ্যে থেকে জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার গুরুগুরু কণ্ঠে, 'কিন্তু সে চেষ্টা অন্ধকার সমাগমে করা যাবে-খন। এই মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্তে তুমি এবং আমি দুজনেই একমত... যা দেখছি, তা এই পৃথিবীর ওপরকার কোনও দৃশ্য নয়। একমত হচ্ছি ঠিকই... কিন্তু সিদ্ধান্তটাকে যাচাই করতে তো পারছিই না, ফেলেও দিতে পারছি না।'

ঝটিতি জবাব দিল হোমস, 'চ্যালেঞ্জার, খেয়াল রাখবেন... সিদ্ধান্তটা নিছক অনুমান ভিত্তিক... যুক্তিভিত্তিক নয়। তবে হ্যাঁ, যা দেখেছি, তা যেন সামনের ওই মাস্তুলদের মতো কোনও একটা তালঢ্যাঙা মাস্তুলের ওপর থেকেই দেখছি। সারবন্দি মাস্তুলদের শেষ কোনও মাস্তুলের ডগা থেকে যেন সব কিছু চোখে পড়ছে।'

সায় দিলেন চ্যালেঞ্জার একবাক্যে, 'আমারও ধারণা তা-ই।'

হোমস উঠে পড়ল, 'আমার অন্য কাজ আছে, চললাম। আপনি কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যান।'

'সেটা না বললেও চলবে।'

নিষ্ক্রান্ত হল শার্লক হোমস। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যেন দুর্ধর্ষ শত্রুর ওপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতোই দ্বিগুণ বিক্রম নিয়ে আক্রমণ করলেন বিজ্ঞানের বিস্ময় সেই ক্রিস্টালকে।

মগজের যাবতীয় শক্তি ফোকাস করলেন সেইদিকে। কী পেলেন, তা যথাসময়ে বর্ণিত হবে।

শার্লক হোমস রাস্তায় নেমে হাতছানি দিয়ে দাঁড় করাল একটা চলমান ছ্যাকড়াগাড়িকে। সেই গাড়িতে আরোহণ করে পৌঁছাল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। দু-দুটো অতি জটিল ক্রাইম কেস নিয়ে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করে জ্ঞানদান করল অফিসারদের। সেখান থেকে আপন আলয়ে ফিরে নিজস্ব মতামত লিখে রাখল অপরাধ রহস্য দুটির ওপর... ক্রিস্টাল রহস্যকে নির্বাসন দিল মস্তিষ্কের সব ক-টা খুপরি থেকে। তারপর নৈশ আহারে বসল বন্ধুবর ডাক্তার ওয়াটসনের সঙ্গে। মত্ত হল বিশ্রম্ভালাপে রোজকার মতো... কিন্তু ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করল না ক্রিস্টাল এবং তার মধ্যে দেখা অপার্থিব দৃশ্যের।

পরের দিন সকালে ওয়াটসন রওনা হল রোগী দেখার অভিযানে। হোমস গেল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ক্রাইম কেস দিয়ে মস্তিষ্কের কোষগুলিকে উত্তেজনা জোগাতে। ফিরে এসে দেখল, বেকার স্ট্রিটে সাদামাটা ঘরটিতে বসে প্রফেসর এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। শুধু বসে নেই, বলতে গেলে ছটফট করছেন। আত্যন্তিক উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়তে চাইছেন। কখনও চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠছেন। ঘরময় পায়চারি করছেন। ফের এসে ধপ করে কাষ্ঠাসনে দেহভার ন্যস্ত করে বন্দুক নির্ঘোষের মতো ভীষণ শব্দে আঙুল মটকাচ্ছেন।

শার্লক হোমসের দীর্ঘ শীর্ণদেহ কক্ষমধ্যে আবির্ভূত হতেই প্রফেসর চ্যালেঞ্জার প্রকাণ্ড গরিলার মতো ধেয়ে এলেন তার দিকে।

বললেন রাশভ কণ্ঠে, 'হোমস তোমার অবর্তমানে তোমার ল্যান্ডলেডির কৃপায় বসবার সুযোগ পেয়েছি ঘরে। ঘরটা যদিও বড় অগোছালো, কিন্তু না এসে পারলাম না। কেন জানো?'

'কেন?' দৃষ্টি সূচ্যগ্র হয়ে এল হোমসের, প্রশান্ত রইল কিন্তু কণ্ঠস্বর।

‘ঠিকই ধরেছ তুমি... ক্রিস্টালের মধ্যেকার দৃশ্য অন্য কোনও গ্রহের। কোন গ্রহ আমি তা বের করে ফেলেছি।’

এবার আর প্রশান্ত রইল না হোমসের কণ্ঠস্বর। উত্তেজনার বিস্ফোরণ ঘটল যেন দ্রিমি দ্রিমি স্বরে, ‘মাই ডিয়ার চ্যালেঞ্জার, বলছেন কী?’

‘মাই ডিয়ার হোমস, ওই রকমই বলি আমি। তোমার ভাষায় যাকে বলা যায়... চমকপ্রদ, অসাধারণ, অদ্ভুত। আমার গবেষণাগার থেকে প্রস্থান করার সময়ে একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রেখে গেছিলে— ক্রিস্টালটাকে যেন নিরন্ধ্র অন্ধকারের সুযোগে অবলোকন করা হয়। আমি তা-ই করেছিলাম। ফোটোগ্রাফাররা যে ধরনের পুরু কালো কাপড় দিয়ে নিজের মাথা আর ক্যামেরার আইপিস ঢেকে ছবি তোলে, সেই ধরনের মোটা কালো কাপড় দিয়ে ক্রিস্টাল আর নিজের মাথা ঢেকেছিলাম যাতে আলোকরশ্মি একেবারেই না প্রবেশ করতে পারে। ফলে আমি যতটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ততটা স্পষ্ট তুমি নিজেও আজ সকালে দেখতে পাওনি। আমি দেখলাম, রজনীর আবির্ভাব ঘটেছে অজানা সেই গ্রহে। তাই দেখলাম না সেই বিচিত্র নিসর্গ দৃশ্য— কিন্তু দেখলাম আকাশের কালো চন্দ্রাতপে মিটমিট করছে অগুনতি নক্ষত্র। মাই ডিয়ার শার্লক হোমস, পিলে চমকানো আবিষ্কারটা করলাম ঠিক তখনই... একটা পরম সত্যের মণিকোঠার দ্বার নিমেষমধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল আমার মনের মণিকোঠার সামনে।’

উদগ্র উত্তেজনায় পৃষ্ঠবংশ বেঁকিয়ে হোমস বললে, ‘কী সেই পরম সত্য, মাই ডিয়ার প্রফেসর চ্যালেঞ্জার?’

মঞ্চের নায়কের মতো বীরোচিত ভঙ্গিমায় প্রশস্ত বুক চিতিয়ে নাটকীয় কণ্ঠে বললেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, ‘ছাদের ঠিক মাথায় যেখানে রাশি রাশি তারা চোখ মিটমিট করে চেয়েছিল আঁধার পানে, তারাদের সেই দঙ্গলের মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করতেই আবিষ্কার করলাম সপ্তর্ষি মণ্ডলকে, দেখলাম সাত তারাকে। বলো, কী বুঝলে?’

‘গ্রহটা পৃথিবী গ্রহ না হলেও পৃথিবীরই প্রতিবেশী কোনও গ্রহ... তাই একই তারকামণ্ডলীকে দেখা যাচ্ছে আকাশে।’

‘এগজ্যাক্টলি। সাত তারার এই নক্ষত্রকে দেখতে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন বা খড়্গের মতো। অজানা গ্রহের আকাশেও দেখলাম সেই একই ঝিকিমিকি জিজ্ঞাসা চিহ্ন। সপ্তর্ষিকে চৈত্র-বৈশাখ মাসের সন্ধ্যায় উত্তর আকাশের খুব ওপরে দেখতে পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়

শ্রাবণে ক্রমেই পশ্চিমে সরে আসে। শেষে ভাদ্র থেকে অঘ্রাণ মাস পর্যন্ত আকাশে দেখাই যায় না। পৌষ মাসে দেখা যায় উত্তর-পূর্ব আকাশে। হোমস, মাসগুলোর নাম শুনে তোমার খটমট লাগছে বুঝতে পারছি... কিন্তু বাংলায় নামগুলো বললাম সপ্তর্ষি নিয়ে অদ্ভুত একটা কাহিনি মনে পরে গেল বলে। যদি পারমিট করো তো বলতে পারি।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে হোমস বললে, 'সংক্ষেপে সারুন।'

'ভারতীয় পুরাণ পড়েছ? পড়োনি? অন্যায় করেছ। আমার মতে প্রতি বৈজ্ঞানিকের উচিত ভারতীয় পুরাণ কণ্ঠস্থ রাখা। তুমি অবশ্য বৈজ্ঞানিক নও। কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞানী তো বটে। আচ্ছা আচ্ছা, সংক্ষেপেই সারছি এবার। পুরাণের মতে উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুবর নামে হয়েছে ধ্রুবতারা। ধ্রুবর মতো সাতজন ঋষিও আকাশে তারা হয়ে আছেন। তাঁদের নামেই এই সাতটি তারার নাম... বশিষ্ঠ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য আর ক্রতু। সপ্তর্ষির মাথার তারা দুটোকে মনে মনে একটা লাইন দিয়ে যোগ করে সেই লাইনটাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে গেলেই ধ্রুবতারার পাশ দিয়ে যাবে। সপ্তর্ষি যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, এই লাইন ধ্রুবতারার পাশ দিয়ে যাবেই মাই ডিয়ার হোমস, এই ভাবেই অজানা গ্রহের আকাশে খুঁজে পেলাম ধ্রুবতারাকেও। এমনকী বশিষ্ঠ মুনির স্ত্রী অরুন্ধতী তারাকেও দেখলাম অস্পষ্টভাবে বশিষ্ঠের পাশেই। এর পরে আর কোনও সন্দেহই রইল না, যে যা দেখছি তা এই সৌরজগতেরই কোনও গ্রহের আকাশ।'

'হুম!' গলার মধ্যে দিয়ে শব্দটাকে ফের বার করল হোমস, 'হুম।'

চ্যালেঞ্জার বললেন, একটু ভুরু কুচকেই বললেন, 'প্লিজ, আমার কথার মধ্যে ওই রকম হুম হুম আওয়াজটা আর ছেড়ো না।... যা বলছিলাম সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং অন্যান্য তারকামণ্ডলও চেনাজানা। কিন্তু এর পরেই যা ঘটল, তা এমনই সৃষ্টিছাড়া যে দেখেই প্রথমে চমকে উঠেছিলাম, সত্যি কথা বলতে কী, দু-চোখ কপালেও তুলে ফেলেছিলাম। সৃষ্টিছাড়া হলেও জিনিস দুটো অকাট্য প্রমাণ... তোমার অনুমানের নিরেট যুক্তি।'

এই পর্যন্ত বলে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার স্তব্ধ হলেন এবং শব্দ করে দুই করতল লাগলেন।

শার্লক হোমস তখন যেন নাচার হয়েই বললে, 'মাই ডিয়ার চ্যালেঞ্জার, আমার হুম বিস্ময়োক্তিটা আপনার কাছে যতখানি পীড়াদায়ক, তার চাইতেও বেশি পীড়াদায়ক আপনার ওই হাতঘষার শব্দটা আমার কাছে।'

'তা-ই নাকি?' ঘন ভুরু নাচিয়ে বললেন চ্যালেঞ্জার।

‘আজ্ঞে, হ্যাঁ। তা ছাড়া, কথা বলতে বলতে ঠিক কাজের কথার জায়গায় এসে থেমে যাওয়াটাও ঠিক নয়... এতে চিন্তার ট্রেন উলটে যায়।’

‘আচ্ছা!’ ফের ভুরু নৃত্য করেই বললেন প্রফেসর, ‘কদ্দূর বলেছিলাম?’

‘দুটো জিনিস দেখেছিলাম... অকাট্য প্রমাণ।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, আশ্চর্য গ্রহের আকাশে দুটো জিনিস। হঠাৎ দিগন্তে চাঁদ উঠল। একটা নয়, দুটো। দুটোই খুব ছোট, রীতিমতো এবড়োখেবড়ো পৃষ্ঠদেশ; এদের একটা এত জোরে উঠে এল এবং এমন পাঁইপাঁই করে গ্রহ পরিক্রমা শুরু করে দিলে যে আমি নিজেও দেখতে পেলাম তার দ্রুত গতি। দেখতে দেখতে ডবল চাঁদ সরে গেল দৃষ্টিপথ থেকে।’ ভীমবেগে বাম করতলে ডান মুষ্ট্যাঘাত করে বললেন চ্যালেঞ্জার, ‘ভায়া... হোমস, অকাট্য প্রমাণটা কী, এবার বুঝেছ?’

গম্ভীর হয়ে গেল হোমস।

বলল, ‘বুঝেছি। সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা মানে সৌরজগতের আকাশ দেখা। আর যমজ চাঁদ দেখা মানে মঙ্গলগ্রহের আকাশ দেখা। তারাদের প্রতিবেশী রক্তরাঙা গ্রহ মঙ্গলের আকাশেই কেবল দেখা যায় ডবল চাঁদ... ডিমোস আর ফোবোস।...’

‘হোমস, মঙ্গল গ্রহের প্রাকৃতিক দৃশ্যই দেখেছি আমরা... যমজ চাঁদই অকাট্য প্রমাণ।’ প্রকাণ্ড মাথা নেড়ে সায় দিলেন প্রফেসর।

‘সূর্যের অস্তিত্বের মতোই অকাট্য এবং পরম সত্য।’

ঠিক এই সময়ে টোকা পড়ল দরজায়। মুখ বাড়িয়ে বিলি বললে, ‘মিস্টার হোমস, এক ভদ্রলোক এসেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে।’

বিলির কথা শেষ হতে না হতেই পাল্লা আরও ফাঁক করে সুট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল নার্ভাস প্রকৃতির এক টেকো পুরুষ। এক হাতে টুপিটা নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না... চালান করছে ডান হাত থেকে বাঁ হাতে, আবার বাঁ হাত থেকে ডান হাতে। টুপিটা যেমন নোংরা, তেমনি বদখত।

‘স্যার,’ কেশেটেসে গলা সাফ করে নিয়ে বললে আগন্তুক, ‘আমি বল্ডুইন বলছি।’

শুষ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শুষ্কতর কণ্ঠে বলল শার্লক হোমস, ‘চিনতে পেরেছি।’

আরও ঘাবড়ে গেল বল্ডুইন।

‘আপনি কি খুবই ব্যস্ত?’

‘একটু।... দু-মিনিট সময় দেওয়া যাবে আপনাকে।’

তড়বড় করে উঠল বল্ডুইন, ‘স্যার, ক্রিস্টাল ডিমটার দাম পাঁচ পাউন্ড নয়... অনেক বেশি।’

‘হতে পারে। কিন্তু বেচেছেন পাঁচ পাউন্ডে... দামটা চড়াতেও এসেছেন অনেক দেরিতে।’

‘মর্স হাডসন বলছিল, আরও বেশি দাম পাওয়া যাবে দুই ভদ্রলোকের কাছে। একজন সেন্ট ক্যাথরিন হাসপাতালের মিস্টার জ্যাকব ওয়েজ। আর একজন জাভার প্রিন্স অফ বসো-কুনি। দুজনেই টাকার কুমির। এঁদের কাছ থেকে দুটো পয়সা বেশি লাভ করলে আমি আর মর্স হাডসন ভাগাভাগি করে নিতে পারতাম।’

কঠোর হল শার্লক হোমসের ধূসর চক্ষু, চোয়ালের হাড় এবং কণ্ঠস্বর, ‘বল্ডুইন, মর্স হাডসনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে জেলে যাওয়ার পথটা আপনি নিজেই পরিষ্কার করে রেখেছেন। চোরাই আংটি যদি আপনার দোকানঘরে ফেরত না দিত, আপনাদের দুজনকেই শ্রীঘর দর্শন করিয়ে ছাড়তাম। আর, এখন তার উশকানিতে বেশি মুনাফার লোভে যে জিনিসটা ফেরত নিতে এসেছেন আমার দখলে আর তা নেই।’

গুড়গুড় করে মেঘ ডাকা গলায় চ্যালেঞ্জার বললেন, ‘খাঁটি কথাই বলেছেন মিস্টার হোমস। জিনিসটা ওঁর দখলে আর নেই।’

ফোঁস করে উঠল বল্ডুইন, ‘বুঝব কী করে যে উনি খাঁটি কথা বলেছেন? তা ছাড়া আমাদের কথায় আপনি ফোড়ন দিতে আসছেন কেন? আপনাকে তো আমি চিনি না।’

আর যায় কোথা! তড়াক করে গরিলা সদৃশ বপু নিয়ে অবিশ্বাস্য বেগে চেয়ার থেকে ছিটকে গেলেন প্রফেসর, ‘কী! আমার কথায় অবিশ্বাস। বৎস ইঁদুর, আমার নাম জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। হোমস, পথ ছাড়ো— ইঁদুরটাকে এখান থেকেই সোজা ছুড়ে ফেলে দিচ্ছি রাস্তায়!’

সেই রুদ্র মূর্তি, বাজখাঁই কণ্ঠস্বর, নীল চোখের আগুন দেখেই প্রকৃতই ইঁদুরের মতো চক্ষের নিমিষে সড়াৎ করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল বল্ডুইন। ইঁদুর ছোড়ার এমন সুযোগ হাত ফসকে যাওয়ায় চ্যালেঞ্জার আরক্ত মুখে ফের আসন গ্রহণ করলেন চেয়ারে।
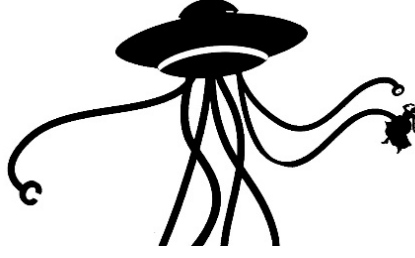
বললেন কালবৈশাখী গলায়, ‘রাসকেলটাকে যদি ধরতে পারতাম... যাকগে, ক্রিস্টাল নিয়ে আরও গবেষণার দরকার। হোমস, ব্যাপারটা আপাতত তোমার আমার মধ্যেই গোপন থাকুক— আর কাউকে বোলো না।’

‘সেকী! বৈজ্ঞানিক মহলের মতামত দরকার যে!’

‘বৈজ্ঞানিক মহল!’ চ্যালেঞ্জার মনে হল জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মতো গুমগুম করে উঠলেন, ‘তারা নতুন তত্ত্ব আর অভিনব তথ্যের বোঝে কী? বাগড়া দিতে জানে, তর্ক করতে জানে, মূর্খের দল!— না, হোমস, কাউকে না। আজ বিকেলে চারটের সময়ে এসো আমার বাড়িতে।’

‘আসব। ডাক্তার ওয়াটসনকে বলব? ওর মাথা কিন্তু সাফ।’

‘প্লিজ। এখন কাউকে নয়। আসি এখন।’

মঙ্গলের উড়ন্ত বিভীষিকা

সেইদিনই বিকেলে এনমোর পার্কের পড়াশুনার ঘরে ফের ক্রিস্টাল নিয়ে হাজির হলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং শার্লক হোমস। কালো কাপড়ের অবগুণ্ঠনে দুই স্বনামধন্য পুরুষ নিজেদের মুণ্ড ঢেকে দৃকপাত করলেন বিচিত্র ক্রিস্টালের পানে। বাইরের ছিটেফোঁটা আলো পর্যন্ত প্রবেশপথ খুঁজে পেল না ঘোমটার আড়াল দিয়ে।

যেই বন্ধ হল আলোর প্রবেশপথ, অমনি নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে দ্যুতি বিকিরণ শুরু করে দিলে ক্রিস্টাল বল। সাধারণ দ্যুতি নয়— যেন নীল আভা ঠিকরে বেরতে লাগল ভেতর থেকে। হোমসের ধারালো নাক চিবুক আলোকিত হল নীলাভ আভায়, আলোকিত হল চ্যালেঞ্জারের বিশাল দাড়ির জঙ্গল। দু-হাতের মধ্যে সন্তর্পণে ক্রিস্টালকে ঘুরিয়েফিরিয়ে সঠিক অবস্থায় আনবার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন প্রফেসর।

সফলও হলেন। আচম্বিতে দেখা গেল পুঞ্জ পুঞ্জ কুয়াশা। তালগোল পাকিয়ে সরে সরে যাচ্ছে কুয়াশা আবৃত দৃশ্যপট থেকে।

সোল্লাসে, কিন্তু চাপা গলায় বললেন চ্যালেঞ্জার, 'আসছে।'

সত্যিই আসছে। অদ্ভুত সেই দৃশ্যপট, সেই নিসর্গ দৃশ্য, ফের ফিরে আসছে ক্রিস্টালের মধ্যে। দেখা যাচ্ছে লালচে-বাদামি রঙের দিগন্ত ছাওয়া পাহাড় শ্রেণি— যা কিনা দেখতে উঁচু বাঁধের মতোই, দেখা যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের মতো বহুদূর বিস্তৃত মঞ্চের মতো। অবশেষে কুয়াশা আরও দূরীভূত হল— স্পষ্টতর হয়ে উঠল সারিবদ্ধ সুউচ্চ মাস্তুল শ্রেণি—প্রতিটির শীর্ষ দ্যুতিময়। নির্মেঘ গাঢ় নীল আকাশে সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল টলটলে পরিষ্কার কিন্তু পাণ্ডুর সূর্যের মুখ।

চ্যালেঞ্জার বললেন, 'পৃথিবীর ওপরে সূর্যের যে সাইজ, এ যে দেখছি তার অর্ধেক। কারণও আছে। খুব কাছাকাছি এলেও, পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে মঙ্গলের দূরত্ব সাড়ে তিন

কোটি মাইল হয়। কাজেই মঙ্গলের আকাশে সূর্য তো ছোটই দেখাবে। আরে! আরে! ওরা কারা হোমস?'

নীচের ছাদে কারা যেন নড়ছে। গোল বর্তুলের মতো দেহ তাদের। চকচকে। চারপাশ দিয়ে বেরিয়েছে অনেকগুলো শুঁড়। এই শুঁড়ের ওপর ভর দিয়েই তারা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে লম্বাচওড়া আয়তাকার ক্ষেত্রের ওপর!

হোমসও দেখেছিল চলমান প্রাণীদের।

বললে পাতলা ঠোঁট শক্ত করে, 'চ্যালেঞ্জার, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আমরা যা কিছু দেখছি ওই মাস্তুলেরই কোনও একটার মাথা দিয়ে দেখছি। মাস্তুলগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ির ছাদে। তাই দূরের জিনিস অত স্পষ্ট, কিন্তু নীচের কাছের দৃশ্য দেখতে একটু অসুবিধে হচ্ছে।'

রুদ্ধশ্বাসে চ্যালেঞ্জার বললেন, 'ঠিকই বলেছ। আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। সব বাড়ির ছাদেই অদ্ভুত প্রাণীরা টহল দিচ্ছে। ঠিক যেন অক্টোপাস, মাকড়শা, কাঁকড়ার দল। আরে গেল যা, এ যে দেখছি উড়তেও পারে!'

সহসা খুব কাছের একটা ছাদ থেকে বহু শুঁড় বিশিষ্ট গোল বলের মতন চকচকে কালো দেহ নিয়ে শূন্যে উঠে পড়ল একটা প্রাণী। বাদুড় যেমন চামড়া দিয়ে জোড়া প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে উড়ে যায় পৃথিবীর আকাশে, অনেকটা সেইভাবেই আশ্চর্য কিন্তু বদখত সেই প্রাণীটা শূন্যে উড়ে গেল অবলীলাক্রমে— ক্রমশ ওপরে উঠতে উঠতে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্রিস্টালের মধ্যে।

হোমস বলল, 'ডানা নাড়ছে না কিন্তু।'

'হয়তো নাড়ানোর মতো ডানা নয়— তাই নাড়ছে না।'

হোমসের দিকেই উড়ে আসতে আসতে হঠাৎ অন্যদিকে উড়ে গেল উড়ুক্কু প্রাণীটা। কাছের একটা মাস্তুলশীর্ষে পৌঁছে লিকলিকে শুঁড় দিয়ে মাস্তুল আঁকড়ে ধরে চেপে বসল ডগায়।

বিষম উত্তেজিত হয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন, 'হোমস! হোমস! খুঁটির ডগায় কী করছে বলো তো?'

'আমরা যা করছি তা-ই। তার মানে আমরা যেমন ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে দেখছি— মঙ্গলের প্রাণী তেমনি দেখছে আমাদের।'

‘অ। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে একমত হওয়ার আগে একটু তর্ক করতে চাই।’

‘পরে করবেন। ওই দেখুন, মঙ্গলের জীব এবার এদিকেই আসছে।’

বাস্তবিকই, কাছের মাস্তুলশীর্ষ ছেড়ে দিয়ে সটান যেন ওঁদের দিকেই উড়ে আসছে উড়ুক্কু জীবটা।

ঝড়ের বেগে চ্যালেঞ্জার বললেন, ‘অদ্ভুত ডানা তো— একদম নাড়ছে না।’

হোমস বললে শীতলকণ্ঠে, ‘ডানা নাও হতে পারে।’

‘তবে কী?’

‘মেশিন। ওড়বার যন্ত্র।’

‘রাবিশ। চেহারা যাদের পোকার মতো, তাদের আবার ওড়বার মেশিন; হোমস, কল্পনাকে বেশি ছুটিও না। আমার মতে, এটা হয় পুরুষ, না-হয় স্ত্রী। ব্যাটাছেলে অথবা মেয়েছেলেরা উড়তে পারে। তাই একদল ছাদে নড়ছে— উড়তে পারছে না। এসে গেছে।’

একদম কাছে এসে গেছে উড়ুক্কু প্রাণী। ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল একজোড়া ভাঁটার মতো সুবিশাল চোখ যেন ওঁদের দিকেই চেয়ে রয়েছে নিষ্পলকে। পরমুহূর্তেই আরও কাছে এসে গেল মঙ্গলগ্রহী। ডানা আর দেখা গেল না— শুধু একজোড়া চোখ। তারপরেই ক্রিস্টালের বুক জুড়ে শুধু একজোড়া চোখ হিমশীতল চাহনি মেলে চেয়ে রইল ওঁদের দিকে।

এক লহমার জন্যে ঘটল এই কাণ্ড। মেরুদণ্ড পর্যন্ত শিরশির করে উঠল অপার্থিব সেই চাউনির সামনে।

পরক্ষণেই অন্ধকার হয়ে গেল ক্রিস্টালের ভেতরটা। একরাশ নীলাভ দ্যুতি কেবল ঠিকরে এল ভেতর থেকে। আর কিছু না।

কালো কাপড়ের ঘোমটা নিক্ষেপ করে চেয়ার ছেড়ে ছিটকে গেলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। কাগজ পেনসিল এনে ধপাস করে বসলেন চেয়ারে।

বললেন রুদ্ধশ্বাসে, ‘হোমস, তুমিও লেখো। আমিও লিখি। এইমাত্র যা দেখলাম তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখে ফেলি অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে।’

সেকেন্ড কয়েক কাগজের কলম আর পেনসিল চলার খচমচ আওয়াজ এবং প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সেই নাসিকাধ্বনি ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

তারপর পেনসিল নামিয়ে রেখে প্রফেসর বললেন, 'মঙ্গলের একটা শহর দেখলাম এইমাত্র। দেখলাম তাদের ঘরবাড়ি। আর দেখলাম মঙ্গলের জীব, তাদের কেউ কেউ উড়তেও পারে। তারা পোকা শ্রেণির— তাই অমন অক্টোপাসের মতো দেহ।'

হোমস বললে, 'চ্যালেঞ্জার। আপনি সইতে পারেন না— কিন্তু যুক্তি মানেন। সেই ভরসাতেই ফের বলছি— যে জীবটা উড়ে এসে আমাদের দেখে গেল— সে নিজে থেকে ওড়েনি, যন্তর লাগিয়ে উড়েছে। পোকা বলে তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করবেন না। মঙ্গলের সভ্যতা পৃথিবীর সভ্যতার চেয়ে অনেক এগিয়েছে বলেই তাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমরা ধরতে পারছি না।'

'কোন যুক্তিতে একথা বলা হল?' থমথমে মুখে শুধালেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

হোমস বললে, 'এককালে তিমি ডাঙায় ছিল— জলে গিয়ে তাদের ডাঙায় উপযুক্ত প্রত্যঙ্গগুলো প্রায় অদৃশ্য হয়ে এসেছে। মঙ্গলের বুকে যাদের বদখত বপু দেখে পোকা বলছেন, অক্টোপাস বলছেন— কে জানে বিরাট ওই দেহের মধ্যে তাদের ব্রেনটা এত বিরাট বলে লক্ষ লক্ষ বছর কেবল ব্রেনটা খাটিয়ে গেছে, হাত-পায়ের মতো প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করেনি বলে তারা আজ লিকলিকে শুঁড় হয়ে গিয়েছে।'

ঘোঁৎ করে শব্দ করে দাড়ি চুলকে প্রফেসর বললেন, 'মন্দ বলোনি। যুক্তি জিনিসটা আমিও মানি। হোমস, তোমার খাঁটি বিজ্ঞানের লাইনে আসা উচিত ছিল।'

কাষ্ঠ হেসে হোমস বললে, 'বিজ্ঞানের লাইনে আমিও আছি। এর নাম সায়েন্স অব ডিডাকসন— অবরোহ বিজ্ঞান। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়, চ্যালেঞ্জার।'

'তবে কী, ভায়া শার্লক হোমস?'

জবাবটা দেওয়ার আগে আর একবার ক্রিস্টালের মধ্যে তাকানো যাক।'

কথা বলতে বলতেই কালো ঘোমটা দিয়ে নিজের আর চ্যালেঞ্জারের মুণ্ড ঢেকে ক্রিস্টালের মধ্যে তাকাল হোমস। আবার দেখা যাচ্ছে মঙ্গলের দৃশ্য। লাল পাহাড়। ঘন নীল আকাশ। পাণ্ডুর সূর্য। ছাদ, মাস্তুল, দ্যুতিময় শীর্ষ। ছাদে টহল দিচ্ছে ঢিবির মতো থলথলে প্রাণীরা। হঠাৎ একটা প্রাণী উড়ল শূন্যে। কিছুক্ষণ এ-মাস্তুল সে-মাস্তুল দেখে এসে ছাদের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ ডানা খসিয়ে ধপ করে নেমে পড়ল ছাদের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করে উঠে দড়াম করে টেবিল চাপড়ে চ্যালেঞ্জার বললেন, 'হোমস, তোমার বৈজ্ঞানিকই হওয়া উচিত ছিল। ঠিকই ধরেছ তুমি— ডানাটা নকল—

উড়বার যন্ত্র।'

ঘোমটা দিয়ে ক্রিস্টাল চাপা দিয়ে মুখ তুলল হোমস। 'দু-টুকরো হিরের মতো জ্বলছে দুই চক্ষু!'

বললে চোয়াল শক্ত করে চ্যালেঞ্জার, 'প্রশ্নটা এবার বলি। কী চায় ওরা?'

'কী আবার চায়?'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যেমন ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে ওদের দেখছি— ওরাও তেমনি মাস্তুলের ডগায় লাগানো ক্রিস্টাল দিয়ে আমাদের ওপর নজর রাখছে। কিন্তু কেন?'

ঝোপের মতো দুই ভুরু কুঁচকে বললে প্রফেসর, 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আছে বলে। পৃথিবী নামক গ্রহে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মতো এতবড় বিরাট ব্রেনওয়ালা বৈজ্ঞানিক যখন আছে, তখন মানুষ জাতটাও নিশ্চয় পর্যবেক্ষণের বস্তু।'

আনমনা হয়ে গেল হোমস। বললে আপন মনে, 'ওদের ক্রিস্টাল পৃথিবীতে এল কীভাবে? কেন?'

'আফ্রিকার বর্বররা যেমন ইউরোপের কাণ্ডকারখানা বুঝতে পারে না—আমরাও হয়তো সেই অবস্থায় রয়েছি, হোমস।'

হোমস প্রফেসরের চোখে চোখ রেখে বললে আস্তে আস্তে, 'ওদের ক্রিস্টাল পৃথিবীতে পৌঁছেছে আগে। নজরও রাখছে ওরা আমাদের ওপর— এরপর কি ওরা নিজেরাই আসবে এই গ্রহে?'

প্রদীপ্ত হল চ্যালেঞ্জারের নীল চক্ষু, 'পৃথিবী আক্রমণ!'

ঠোঁট টিপে রইল শার্লক হোমস।

ক্রিস্টাল কবে এসেছিল পৃথিবীতে?

নাওয়া-খাওয়া উড়ে গেল চ্যালেঞ্জার এবং হোমসের। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দু-চারটে কেস নিয়ে একটু মাথা ঘামিয়ে চ্যালেঞ্জারের স্টাডিরুমে দৌড়ে আসা আরম্ভ হল হোমসের। চ্যালেঞ্জারও নিবন্ধ লেখা বন্ধ রেখে যখন-তখন মাথায় কালো কাপড় চাপিয়ে দিনের মধ্যে প্রায় ষোলো ঘণ্টা চেয়ে রইলেন ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলগ্রহের শহরের দিকে। চ্যালেঞ্জার-গৃহিণী স্বামীর পাগলামি জানতেন। জিজ্ঞাসাও করলেন না হঠাৎ পড়ার ঘরে হোমসকে নিয়ে দিনরাত বসে থাকা হচ্ছে কেন।

এইরকমই একদিন হোমস পুরোনো প্রশ্নটাই নতুন করে জিজ্ঞাসা করেছিল চ্যালেঞ্জারকে, 'ক্রিস্টালটা পৃথিবীতে এল কীভাবে? কবে?'

প্রফেসর বললেন, 'ভায়া, বিষয়টা নিয়ে আমি মাথা ঘামিয়েছি। আমার এই বিরাট ব্রেন যখন কোনও বিষয় ভাবে, তখন তার সুরাহা করে তবে ছাড়ে।' —বলে, সমর্থনের আশায় প্রোজ্জ্বল চোখে চাইলেন হোমসের পানে।

চ্যালেঞ্জারের আত্মম্ভরিতা বিশ্ববিখ্যাত। অহংকারে মটমট করছেন— শিবের মাথায় বেলপাতা দিলেই যেমন খুশি, চ্যালেঞ্জারের কাছে একটু প্রশস্তি তার চাইতেও বেশি কাজ দেয়।

ধুরন্ধর হোমস তাই তক্ষুনি বললে, 'বিলক্ষণ। আপনার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকরা কেবল আপনাকে চিনতে পারল না, এইটাই যা দুঃখ।'

'ছেড়ে দাও ওসব ইডিয়টদের কথা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ১৮৯৪ সালে একটা প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখা গিয়েছিল মঙ্গলের বুকে। হয়তো তখনই তড়িৎশক্তি অথবা ওই ধরনের কোনও শক্তি মারফত ক্রিস্টালদের পাঠানো হয়েছে পৃথিবীতে।'

'ক্রিস্টালদের।'

‘তা নিশ্চয়। সাত বছর ধরে যারা অত খুঁটি পুঁতে আমাদের ওপর নজর রাখছে, তারা কি একটা ক্রিস্টাল এত ঝামেলা করে পাঠাবে? কক্ষনো না— যত খুঁটি দেখেছি, ততগুলো ক্রিস্টাল কি তারও বেশি এসে পড়েছে পৃথিবীর নানান জায়গায়। সারা পৃথিবীর ছবি ওরা কত বছর ধরে দেখে আসছে খুঁটিদের মাথায় লাগানো নিজেদের ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে।’

‘উদ্দেশ্য?’

‘পৃথিবী আক্রমণ!’

‘ও তো গল্পকথায় অনেক পড়েছি।’

‘অনেক গল্পকথাই তো শেষ পর্যন্ত সত্যি হয় হোমস। মঙ্গলের বুকে খাল দেখে ১৮৭৭ সালে যখন জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়েছিল, তখন তো গল্পকথাই বলা হয়েছিল সব ব্যাপারটাকে। কিন্তু আমরা তো নিজেদের চোখে দেখেছি টানা লম্বা খাল রয়েছে শহরের ঠিক পাশেই।’

হোমসের চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য। ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে দেখা দৃশ্য। দূরে লাল পাহাড়। কাছে আয়তাকার ছাদের পর ছাদ, পাশে সবুজ মাঠ। তারও ওদিকে সুদীর্ঘ জলপথ। খাল। মাঠে চলমান মঙ্গলগ্রহীদের যন্ত্রযান। বিভিন্ন সাইজের, বিভিন্ন আয়তনের। বেশির ভাগই মনে হয় স্বয়ংচালিত। কোনও মঙ্গলগ্রহী নেই আশপাশে। তারা কেউ শুঁড়ের উপর ভর দিয়ে হাঁটছে মন্থরগতিতে— কেউ নকল ডানা লাগিয়ে উড়ছে এ-খুঁটি থেকে সে-খুঁটিতে। কর্মব্যস্ততা সর্বত্র। গমগম করছে মঙ্গলের শহর।

চ্যালেঞ্জারের গমগমে গলায় সংবিৎ ফিরল হোমসের, ‘ভায়া কী ভাবছ?’

‘ভাবছি, এতবড় শহর, এত প্রাণী— অথচ এতদিন শুনেছিলাম মঙ্গলে বাতাস নেই, জল নেই।’

‘কিন্তু এখন তো জল দেখলে। বাতাসটা নিশ্চয় ওরা তৈরি করে নিচ্ছে।’

‘মঙ্গলের জীবরা?’

‘হ্যাঁ। লাল মাটি মানেই অক্সিডাইজড মাটি। ওই বাড়িগুলো আসলে ওদের কলকারখানা। দেখেছ তো এমনভাবে তৈরি যে বাইরে থেকে চট করে ভেতরে ঢোকা মুশকিল। আমার মনে হয় ওই কলকারখানার মধ্যেই বড় বড় মেশিনে মাটি থেকে অক্সিজেন বার করে নিয়ে নকল হাওয়া তৈরি করে বেঁচে আছে মঙ্গলগ্রহীরা।’

‘লোকে শুনলে কিন্তু উদ্ভট কল্পনা বলবে।’

বলেই হোমস বুঝল বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বজ্রগর্জনে কড়িকাঠ পর্যন্ত কাঁপিয়ে চ্যালেঞ্জার টেবিলে দমাদম ঘুসি মারতে মারতে বললেন, ‘কোন বেল্লিকটা বলে সেকথা?’

অত ঘুসি খেয়ে নিষ্প্রাণ টেবিল পর্যন্ত শিউরে উঠল যেন। ক্রিস্টাল গড়িয়ে গেল ওপর থেকে, কিন্তু মাটিতে পড়ার আগেই খপ করে লুফে নিয়ে হোমস বললে, ‘আপনাকে যারা দেখতে পারে না— সেই পিগমি বৈজ্ঞানিকরা।’

আগ্নেয়গিরি নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গজরাতে গজরাতে চ্যালেঞ্জার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘দাও ক্রিস্টালটা।’

মঙ্গলে অগ্ন্যুৎপাত?

ডিসেম্বর গড়িয়ে গিয়ে জানুয়ারি এসে গেল। সালটা ১৯০২। মে মাস শুরু হল। দীর্ঘ এই ক-টি মাস শার্লক হোমস ব্যস্ত রইল চোর-ডাকাত-খুনে-গুন্ডাদের রহস্য নিয়ে। ফাঁকে ফাঁকে দৌড়ে যেত চ্যালেঞ্জারের বাড়িতে। গিয়ে দেখত যোগীবরের মতো ক্রিস্টাল নিয়ে মঙ্গলের চেহারা দেখে চলেছেন ভদ্রলোক। আর লিখে চলেছেন পাতার পর পাতা।

ক্রিস্টাল রহস্য কিন্তু আর কেউ জানল না। প্রফেসরের কড়া নির্দেশে ডাক্তার ওয়াটসনকে পর্যন্ত হোমস কিছু বলল না। প্রফেসরের সহধর্মিণীও কিছু জানলেন না।

কিন্তু মে মাসের তেরো তারিখে জেনে গেল পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়কর অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়েছে মঙ্গলের বুকে। ব্রেকফাস্ট টেবিলে খেতে খেতে ওয়াটসনই প্রথম দেখল খবরটা খবরের কাগজে। জাভার একটা মানমন্দির থেকে দেখা গেছে, আগের দিন মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ ঠিক যেন কামান থেকে আগুনের রাশি ছুটে আসার মতো অগ্নিবর্ষণ ঘটেছে মঙ্গলগ্রহের বুকে। স্পেকটোগ্রাফ বিশ্লেষণ করে অবশ্য জানা গেছে, অতি-উত্তপ্ত হাইড্রোজেন ঠিকরে বেরুচ্ছে মঙ্গলপৃষ্ঠ থেকে, ভয়ংকর বেগে ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে রহস্যময় অগ্নিদ্যুতি।

খবরটা পড়ে শুনিয়েই একটা মিটিং অভিমুখে দৌড়াল ওয়াটসন। হোমসও উঠে গিয়ে টেলিফোন করল প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে।

রিসিভার ধরলেন প্রফেসর স্বয়ং, 'হোমস নাকি? চলে এসো। দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো খবর পরিবেশনের সময় এবার হয়েছে। স্টেন্টকে ডেকে পাঠিয়েছি—জ্যোতির্বিদ স্টেন্ট।'

চ্যালেঞ্জারের বাড়ি গিয়ে হোমস কিন্তু দেখল তুমুল কিছু একটা হয়ে গিয়েছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছটফট করছেন প্রফেসর-জায়া। হোমসকে দেখেই দৌড়ে এসে

বললেন, ‘এক্ষুনি যান— জর্জকে থামানো যাচ্ছে না।’

ওপরতলায় গিয়ে হোমস দেখল রুদ্রমূর্তিতে পায়চারি করছেন জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। কী ব্যাপার? না, সেন্ট নামধারী জ্যোতির্বিদ ক্রিস্টালের মধ্যে বিস্ময়কর দৃশ্যটি দেখবার পর প্রফেসরকে রবার্ট হুডিনির মতো প্রতিভাধর ম্যাজিসিয়ান বলেছিলেন এবং ম্যাজিক লণ্ঠনের চাইতে অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কারের কৃতিত্ব দিয়েছিলেন। চ্যালেঞ্জার এই কৃতিত্ব গ্রহণ করতে পারেননি। ভদ্রলোককে সবলে দোতলা থেকে একতলায় ছুড়ে ফেলে দেওয়ার জন্যে শুধু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু মনোভাব ব্যক্ত করার আগেই এবং তা কার্যে পরিণত করার আগেই নাকি ভীতু খরগোশের মতো পড়-পড় করে দৌড়ে পালিয়েছেন স্টেন্ট। এ কী অসভ্যতা? সৌজন্য বলে জিনিসটা কি জানা নেই স্টেন্টের? বাড়ি থেকে বিদেয় হওয়ার আগে বিদায় নিতে হয় গৃহস্বামীর কাছে, এটা কি শিখিয়ে দিতে হবে?

ক্ষিপ্ত প্রফেসরকে ঠান্ডা করে ক্রিস্টালের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চমকে উঠল শার্লক হোমস।

মঙ্গলের দৃশ্য তো আর দেখা যাচ্ছে না। এ তো একটা ধাতব কক্ষ। অদ্ভুত যন্ত্রপাতি দেখা যাচ্ছে কক্ষের গায়ে। চৌকোনা ঘর নয়— চোঙার মতো। মেঝের ওপর নিমেষহীন নয়নে তাকিয়ে নেতিয়ে পড়ে রয়েছে কয়েকটা মঙ্গলের প্রাণী। খুব কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে এবার। চামড়ার মতো গা ভিজে রয়েছে— চকচক করছে। শুঁড়গুলো এলিয়ে রয়েছে যন্ত্রপাতির ওপর। প্রায় নিস্পন্দ বললেই চলে বীভৎস জীবগুলোকে।

গা ঘিনঘিন করে উঠল হোমসের। বললে, ‘গা চকচক করছে কেন? ঘেমেছে নাকি?’

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রফেসর বললেন, ‘চামড়া থেকে গ্রন্থির রসক্ষরণ জাতীয় কিছু একটা হচ্ছে নিশ্চয়। মানুষের মতো মোটেই নয় এরা— সুতরাং এদের পাচনতন্ত্র এবং শরীর থেকে আবর্জনা বার করে দেওয়ার ব্যবস্থাও নিশ্চয় অন্য রকমের।’

ড্যাবডেবে চোখে চেয়েই রইল মঙ্গলের জীবরা। ঘুমোয় না নাকি? জলভরা চামড়ার থলির মতোই চকচকে দেহটা থেকে থেকে কেবল ফুলে উঠছে।

হোমস বললে, ‘মঙ্গলের দৃশ্য আর দেখা যাচ্ছে না কেন?’

‘কারণ ওরা আর মঙ্গলে নেই।’

‘তবে কোথায়?’

‘মহাশূন্যে। শূন্যপথে মহাকাশযানে চেপে ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে। পৃথিবী অভিযান শুরু করেছে মঙ্গলগ্রহীরা। এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম মাথামোটা স্টেন্টকে— আমাকে বলে কিনা ম্যাজিসিয়ান!’

কথাটা ঘুরিয়ে দিল হোমস, ‘কিন্তু পৃথিবীতে ওরা আসছে কেন?’

‘পৃথিবীকে জ্ঞান দিতে। অথবা পৃথিবীর জ্ঞান লুঠ করতে। দুটোই সমান বিপজ্জনক পৃথিবীর পক্ষে।’

‘বৈজ্ঞানিকদের তাহলে তো সজাগ করা দরকার?’

ফুঁসে উঠলেন প্রফেসর, ‘স্টেন্টের সঙ্গে ওই ঘটনার পরেও কি আমার আক্কেল হয়নি বলতে চাও? হোমস, পুরোধা যাঁরা হন চিরকালই তাঁদের এমনি হাসি টিটকারি বিদ্রুপ গালাগাল সহ্য করতে হয়েছে। জীবাণুর জন্যেই রোগ হয়, এই কথা বলতে গিয়ে পাস্তুর কি বছরের পর বছর বিদ্রুপের পাত্র হননি? গ্যালিলিওকে চূড়ান্ত শাস্তি পেতে হয়নি সূর্যের চারদিকে গ্রহরা ঘুরছে— এই কথা বলতে গিয়ে? ডারউইনের বিবর্তনবাদকে মিথ্যের ঝুড়ি বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়নি? মাই ডিয়ার হোমস, জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জারও হাস্যাস্পদ হবে মঙ্গলগ্রহীরা পৃথিবী আক্রমণ করতে আসছে— এই কথা বললে। সুতরাং—’

সুতরাং মুখে চাবি দিয়েই রইলেন প্রফেসর। সেই সঙ্গে হোমস। কিন্তু সেই দিনই মধ্যরাত্রে ফের আগুনের ঝলক দেখা গেল মঙ্গলের বুকে। তারপরের দিন মধ্যরাত্রে আবার। তারপরেও আবার। এইভাবে ১২ মে মধ্যরাত্রি থেকে শুরু করে ২১ মে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আগুনের পাহাড় থেকে আগুন ছিটকে যাওয়ার মতো, অথবা বিশাল কামান থেকে অগ্নিবর্ষণের মতো, মোট দশবার বিস্ময়কর অগ্নি বিচ্ছুরণ ঘটল মঙ্গলের বুকে। সারা ইউরোপ, সারা পৃথিবীর মানমন্দির থেকে দেখা গেল এই দৃশ্য।

এইচ জি ওয়েলস তাঁর বিখ্যাত “ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস” উপন্যাস লেখার আয়োজন করলেন প্রায় সেই সময় থেকেই।

রোজ রাত্রে এসে ক্রিস্টালের দিকে চেয়ে থাকে হোমস। মঙ্গলের জীবেরাও চোখের পাতা না ফেলে চেয়ে থাকত ওর পানে। দুজনে দেখছে দুজনকে। মঙ্গলগ্রহীর মুখ ভাবলেশহীন। হোমস উত্তেজিত। তারপর ফুস করে একসময়ে নিভে যেত ক্রিস্টালের আলো।

সঙ্গে সঙ্গে গাঁকগাঁক করে উঠতেন চ্যালেঞ্জার, ‘বুঝলে কারণটা? মঙ্গলের ওপর থেকে নিজেদের ক্রিস্টাল নিয়ে মহাকাশযানে চড়েছে মঙ্গলের জীব। দেখছে আমাদের প্রতিক্রিয়া। বুঝতে পারছে না পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একটা মস্তিষ্কও মাথা ঘামাচ্ছে ওদের নিয়ে।’
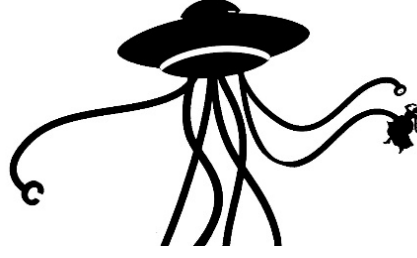
নীল বিদ্যুৎ

২২ মে-র পর থেকে অগ্নিঝলক আর দেখা গেল না মঙ্গলের বুকে। কিন্তু ৬ জুন একটা টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোল হোমসের নামে। পাঠাচ্ছে বৈদেশিক দপ্তর থেকে স্যার পার্সি ফেল্পস।

'আজ সকালে ওকিং-এর কাছে একটা বিরাট চোঙা পড়েছে। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, ভেতরে জীবন্ত প্রাণী রয়েছে। আজ সন্ধ্যায় চলো আমার সঙ্গে। সাহায্য দরকার।'

টেলিগ্রাম পেয়েই সটান চ্যালেঞ্জারের বাড়ি গেল হোমস। প্রফেসর বাড়ি নেই— ওকিং গেছেন।

সন্ধে নাগাদ স্যার পার্সির সঙ্গে ওকিং-গামী ট্রেনে চেপে বসল শার্লক হোমস।

ওকিং শহর আর হরসেল এবং ওটারশ গ্রামের মাঝখানে বিরাট একটা তেপান্তরের মাঠ আছে। শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে এই মাঠের মধ্যিখানে একটা মস্ত গর্ত দেখা দিয়েছে রাতারাতি। আকাশ থেকে জ্বলন্ত গোলা এসে পড়েছে নাকি সেইখানে।

গাঁয়ের লোক এবং শহরের লোক ছুটে এসেছিল রগড় দেখতে। জ্বলন্ত গোলা ঠান্ডা হয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল একটা অতিকায় চোঙা। চোঙার ডালাও নাকি একসময়ে খুলে গিয়েছিল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এবং আবির্ভূত হয়েছিল মাকড়শা অথবা অক্টোপাসের মতো বিদঘুটেদেহী জীবেরা।

কাতারে কাতারে লোক সারাদিন দাঁড়িয়ে গর্ত ঘিরে। বিরাট গর্ত। চারপাশে মাটি উঁচু হয়ে গিয়েছে বাঁধের মতো। পাড়ে দাঁড়িয়ে হুজুগে মানুষরা উৎসুক চোখে দেখছে অদ্ভুত ধাতু দিয়ে তৈরি আশ্চর্য সিলিন্ডারটাকে।

তখন সন্ধে নামছে। সূর্য ডুব দিয়েছে।

হন্তদন্ত হয়ে স্যার পার্সির সঙ্গে শার্লক হোমস এসে পৌঁছাল অকুস্থলে। স্যার পার্সিকে দেখেই এগিয়ে এল স্থানীয় মানমন্দিরের এক জ্যোতির্বিদ— ওগিলভি।

বললে, 'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এসেছিলেন।'

শান্ত কণ্ঠে হোমস বললে, 'তারপর?'

'স্টেন্টের সঙ্গে একচোট হয়ে গেল। সায়েন্টিস্ট স্টেন্ট— ওই দেখুন ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন। চ্যালেঞ্জার আবোলতাবোল কথা বলতে গিয়েছিলেন— হালে পানি না পেয়ে রেগেমেগে চলে গেলেন!'

'কী কথা?'

'সিলিন্ডারটা নাকি মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছে। ভেতরকার ওই অক্টোপাসের মতো প্রাণীরা মঙ্গলগ্রহের জীব। ওদের কাছাকাছি না যাওয়াই এখন মঙ্গল।'

'আপনি দেখেছেন অক্টোপাসদের?'

'গাঁয়ের লোকেরা দেখেছে। কেউ বলে বিরাট মাকড়সার মতো। বুড়ো বয়েসে প্রফেসরের ভীমরতি হয়েছে। পোকামাকড় কখনও সিলিন্ডারে চড়ে মঙ্গলগ্রহ থেকে আসতে পারে? কী বলেন?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হোমস বললে, 'স্টেন্ট ওখানে কী করছেন?'

ওগিলভি বললে, 'ওই যে ক্যামেরা হাতে ভদ্রলোককে দেখছেন, উনি খবরের কাগজের লোক। চোঙার প্রাণীদের কাছে আমরা এখন একটা প্রতিনিধির দল পাঠাব। নেতৃত্ব দেবেন স্টেন্ট, সঙ্গে থাকবেন রিপোর্টার। আমিও যাচ্ছি। স্যার পার্সি, চলুন আপনিও বৈদেশিক দপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে।'

খপ করে স্যার পার্সির কাঁধ চেপে ধরে শার্লক হোমস বিনয়ক্ষরিত কণ্ঠে বললে, 'আজ্ঞে না। বৈজ্ঞানিকদের ইচ্ছে হয় আবিষ্কারের নেশায় ছুটে যেতে পারেন, তবে আমার কথা যদি শোনেন— তাহলে পৃথিবীর বাইরে থেকে যারা এসেছে, তাদের মতলব আঁচ না-করা পর্যন্ত, প্রতিনিধি পাঠাতে যাবেন না— কথাবার্তার চেষ্টা করবেন না।'

হোমসের দীর্ঘ শীর্ণ বপুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমায় ওগিলভি বললে, 'মহাশয়ের নাম জানতে পারি?'

জবাবটা দিল স্যার পার্সি, 'শার্লক হোমস।'

চোখ কপালে উঠে গেল ওগিলভির, 'শার্লক হোমস! নৌদপ্তরের দলিল নিয়ে এ-অঞ্চলে আপনিই তো এসেছিলেন ১৮৮৮ সালে!'

'এগজ্যাকটলি।' নীরস কণ্ঠ হোমসের।

কপাল থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে ওগিলভি বললে, 'আপনার মতো সাহসী পুরুষ আমাদের সঙ্গে থাকলে খুশিই হতাম। চলি, ওঁরা ডাকছেন।'

একরকম ছুটেই রক্তিম-মুখ স্টেন্টের দিকে চলে গেল ওগিলভি। শেষ কথাটায় শার্লক হোমসের সাহসের প্রতি কটাক্ষ কিন্তু হোমসকে স্পর্শও করল না। সে চেয়ে রইল স্টেন্টের দিকে ঈষৎ উদ্বিগ্ন চোখে।

স্টেন্টের হাতে একটা লাঠির ডগায় সাদা পতাকা। দু-পাশে ক্যামেরা হাতে খবরের কাগজের রিপোর্টার এবং ওগিলভি। তিনজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সিলিন্ডারের আরও কাছে। স্টেন্ট নাড়ছে শ্বেত পতাকা।

স্যার পার্সি বললে, 'এতেই কাজ হবে। আমাদের বন্ধুত্বের নিশানা ঠিক বুঝবে ভিনগ্রহের আগন্তুকরা।'

হোমস বললে, 'অন্য গ্রহ থেকে যারা এসেছে, তারা এ-গ্রহের রীতিনীতির কী জানে? সাদা পতাকার অন্য মানেও তো করতে পারে?'

ঠিক এই সময়ে দেখা গেল লম্বা রডের ওপর একটা আয়নার মতো বস্তু আস্তে আস্তে ঘুরে গেল আগুয়ান প্রতিনিধিদলের দিকে। গোধূলির ম্লান আভায় রডের শীর্ষদেশে দুলন্ত আয়নাসদৃশ বস্তুটাকে এতক্ষণ দেখতে পায়নি হোমস। এইবার স্পষ্ট দেখা গেল। চোঙার ভেতর থেকে লম্বা রডের ডগায় থিরথির করে কাঁপছে অনেকটা ফণাতোলা কেউটের মতো অদ্ভুত আয়না।

আচম্বিতে আরও একটা জিনিস উঠে এল নীচ থেকে। গোখরোর চ্যাটালো ফণার মতো একটা ঢাকনি দেওয়া বস্তু। অনেকগুলি সন্ধিযুক্ত একটা ধাতব হাত উঠিয়ে নিয়ে এল গোখরোর ফণাকে। আঁকাবাঁকা বহু সন্ধিযুক্ত ধাতুর হাত বিচিত্র ফণাটাকে যেন তাগ করে ধরল আগুয়ান প্রতিনিধিদলের দিকে। পাশেই স্থির হয়ে রইল আয়নার মতো জিনিসটা। দুটো বস্তুই উদ্যত এগিয়ে-আসা তিন মূর্তির দিকে।

পতাকা নাড়তে নাড়তে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল তিন মূর্তি।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শার্লক হোমস। দৃষ্টি নির্নিমেষ।

অকস্মাৎ একতাল সবুজ বাষ্প ভক করে উঠে এল নীচ থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই চোখ ধাঁধানো নীল বিদ্যুৎ ছুটে গেল গোখরোর ফণার মতো অদ্ভুত দর্শন জিনিসটার মধ্যে থেকে — সোজা প্রতিনিধিদলের দিকে। নীল বিদ্যুৎ মিলিয়ে গেল পর মুহূর্তেই— বাতাস যেন গুঙিয়ে উঠল তীব্র কাতরানিতে— লক্ষ ভোমরা যেন গুনগুনিয়ে উঠল রক্তহিম করা গজরানিতে সিলিন্ডারের দিকে।

ভয়াবহ কাণ্ডটা ঘটল একই সঙ্গে। নীল বিদ্যুৎ প্রায় অদৃশ্য আকারে তিন মূর্তির দিকে ধেয়ে যেতেই সহসা নীল আগুনে আপাদমস্তক ঢেকে গেল তিন মূর্তির। বিকট আতসবাজির মতোই নিমেষে দাউদাউ করে নীল আগুনে জ্বলে উঠেই তিনটে অঙ্গার দেহ আছড়ে পড়ল পেছন দিকে। দেহ বলে তাদের আর চেনাও যায় না।

বিষম হট্টগোল শোনা গেল পাড়ে দণ্ডায়মান জনতার দিক থেকে। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ছুটল তারা মাঠের দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই নীল বিদ্যুৎ আবার ধেয়ে গেল সেইদিকে, আবার গজরে উঠল লক্ষ ভোমরা, আবার অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হল পলায়মান জনতা। জ্বলতে জ্বলতে আছড়ে পড়ল মাঠের ওপর।

অস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে স্যার পার্সি যেই পেছন ফিরে ছুটতে গেছে, অমনি সাঁড়াশির মতো আঙুলে শার্লক হোমস তার কাঁধ খামচে ধরে এক হ্যাঁচকায় শুইয়ে দিল পাড়ের আড়ালে মাটির ওপর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভোমরা গর্জনে বাতাস ফালাফালা করে মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল নীল বিদ্যুৎ। দূরে পলায়মান মানুষগুলো জ্বলে উঠল নীল বাজির মতো। আরও দূরে মাইল দুয়েক তফাতে গ্রামের ঘরবাড়িতে আগুন ধরে গেল চক্ষের নিমেষে। দাউদাউ করে অলতে লাগল গাছগুলো পর্যন্ত।

চারদিকের আর্তনাদ আর ভোমরা গর্জনের মধ্যে বিহ্বল কণ্ঠে স্যার পার্সি বললে, 'হোমস! হোমস! এখানেই শুয়ে থাকবে?'

'না!' মাটিতে বুক চেপে শুয়ে থেকে হোমস বললে, 'ওদের যন্ত্রদৃষ্টিতে ধরা না দিয়ে পালাতে হবে। ওই যে খালটা দেখছ, ওর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাই, দেখতে পাবে না।'

তখন আকাশে তারা ফুটছে। লেলিহান আগুন দেখা দিচ্ছে দিকে দিকে। মাথার ওপর দিয়ে তখনও ছুটে যাচ্ছে নীল বিদ্যুৎ। তীক্ষ্ণ শব্দে বাতাস ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে।

দুই বন্ধু প্রাণ হাতে করে কেঁচোর মতো মাটি দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়ে পড়ল সরু খালে। এগিয়ে গেল ওইভাবেই আরও দূরে। জ্বলন্ত গাছপালার ফাঁক দিয়ে উঠল রাস্তায়। দৌড়ে

ফিরে এল ওকিং গ্রামে।

সটান উঠল স্যার পার্সির বাড়িতে। হাঁপাতে হাঁপাতে স্যার পার্সি বললে, 'হোমস, আজ তুমি না থাকলে—'

'যা দেখলে, ওটা কিন্তু ছোট অস্ত্রের ভেলকি।'

'আরও বড় অস্ত্র আছে?'

'নিশ্চয় আছে। এমন অস্ত্র যা প্রয়োগ করলে ছবির আড়ালে লুকিয়ে থেকেও পার পাওয়া যাবে না।

চলন্ত বয়লার

লন্ডনে ফিরে এল শার্লক হোমস পরের দিন। বেকার স্ট্রিটের বাসায় এসে পেল প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের একটা চিঠি—

মাই ডিয়ার হোমস,

মঙ্গলগ্রহের বিভীষিকাদের সঙ্গে মোকাবিলা আমিই করব। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো দরকার। এর জন্যে যদি আমার প্রাণ যায়, যাক। তোমাকে টানতে চাই না। কারণ আমার চাইতে তোমার মগজ খুব বেশি নিকৃষ্ট নয়। আমি মরলে মঙ্গল বনাম পৃথিবীগ্রহের যুদ্ধে তোমার ব্রেন অনেক কাজ দেবে।

জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার।

চিঠি পেয়েই জবাব লিখে এনমোর পার্কে চ্যালেঞ্জারের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল হোমস। লিখল, মঙ্গলগ্রহীদের ধ্বংসলীলা সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে। মঙ্গলগ্রহীদের অবশ্য স্বচক্ষে দেখেনি— সে-সুযোগও হয়নি। তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে অভিযান আরম্ভ হল এবং ১৯০৪ সালে মঙ্গল যখন পৃথিবীর কাছে আসবে— তখন ওরা আসবে দলে দলে। ওদের চোখে পৃথিবীবাসীরা কীটপতঙ্গের সামিল। তাই মানুষ নিকেশ করছে নির্মমভাবে। অথবা ব্যবহার করবে অন্য কোনও ভাবে। তবে হ্যাঁ, আন্তঃগ্রহ যোগাযোগের যন্ত্র হিসেবে ক্রিস্টাল যন্ত্রটাকে যেন সযত্নে রাখা হয়। এ যন্ত্র ওরা হাতানোর চেষ্টা করতে পারে। তার আগে হোমস চেষ্টা করবে একটা মঙ্গলগ্রহীকে পাকড়াও করে গবেষণা করার — যাতে তাদের নিকেশ করার পথ বার করা যায়। হোমসের ধারণা, এ গ্রহে এসে

নিজেদের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে গিয়ে একটু ঝামেলায় পড়তে পারে মঙ্গলের আতঙ্করা। চ্যালেঞ্জার যেন এই ধারণাটা নিয়ে তলিয়ে ভাবেন।

বিশেষ দূতের হাতে চিঠিখানা পাঠিয়ে সেদিনের খবরের কাগজ নিয়ে বসল হোমস। গভর্নমেন্টের টনক নড়েছে। সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছে। কিন্তু মঙ্গলের আতঙ্করা স্রেফ নীল বিদ্যুৎ অথবা তাপরশ্মি ছুড়ে সৈন্যদের ছাই করে দিচ্ছে! ওরা এবার গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। বিরাটকায় চলন্ত বয়লারের মতো যন্ত্রটা যেন রণপায়ে ভর দিয়ে হাঁটছে! তিনটে ঠ্যাং তাদের। নীল বিদ্যুৎ ছুটছে। বয়লারের মাথা থেকে। মাঝে মাঝে কালো ধোঁয়া। বিষ ধোঁয়া। মানুষ মরছে কাতারে কাতারে।

গতরাত্রে আবার একটা চোঙা খসে পড়েছে ওই একই অঞ্চলে— মাইল তিনেক দূরে। প্রত্যেকটা চোঙার মধ্যে পাঁচজন মঙ্গলগ্রহী রয়েছে। রণপায়ে ভর-দেওয়া বয়লারের সংখ্যাও তা-ই। নীল বিদ্যুৎ ছুড়ে শ্মশানে পরিণত করছে তারা গোটা জেলাকে। একটা বয়লারকে কামান দেগে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বয়লাররা কামানটামান সমেত গোটা সৈন্যবাহিনীকে ছাই করে দিয়েছে।

দাঁতে দাঁত পিষে হোমস বললে ল্যান্ডলেডি মিসেস হাডসনকে, ‘মোট দশটা আগুনের ঝলক দেখা গিয়েছিল মঙ্গলের বুকে পর পর দশ রাতে। দুটো এসে পৌঁছেছে— আরও আটটা আসবে সামনের আটটা রাতে।’

দম বন্ধ করা স্বরে মিসেস হাডসন বললে, ‘আগুনের ঝলকগুলো তাহলে—’

‘চোঙা পাঠানোর ঝলক। একটা করে চোঙাকে ওরা পাঠিয়েছে পৃথিবী লক্ষ করে এক-একরাতে। দুটো এসেছে, আরও আসছে।’

খেয়ে উঠে ওয়াটসনের নামে চিঠি লিখে ম্যান্টলপিসে ছুরি দিয়ে গেঁথে আটকে রাখল হোমস। ওয়াটসন গেছে লন্ডনের বাইরে। ফিরে এসে সে পড়ুক শার্লক হোমসের শেষ কাহিনি— বোধহয় এই শেষ।

কেননা, পৃথিবীরও তো বোধহয় এই শেষ।

কালো ধোঁয়া— উড়নচাকি

স্যার পার্সি হন্তদন্ত হয়ে এল পরদিন সকালে। সরকার বিরাট দায়িত্ব দিয়েছে শার্লক হোমসকে। লন্ডন ছেড়ে যাওয়া চলবে না। এখানে থেকেই ভিনগ্রহী শত্রুদের গতিবিধি নজরে রাখতে হবে এবং লড়াইয়ের পদ্ধতি স্থির করতে হবে। এ-জন্যে এদেশের সর্বোচ্চ খেতাব দেওয়া হবে তাকে যথা সময়ে—নাইটহুড।

‘অর্থাৎ স্যার শার্লক বলবে আমাকে সবাই এখন থেকে?’ মৃদু হেসে বললে হোমস।

‘হ্যাঁ।’

মাথা নাড়ল শার্লক হোমস, ‘আমি মিস্টার শার্লক হোমসই থাকতে চাই— স্যার শার্লক হতে চাই না। সরকার যে কাজ দিয়েছেন, তা দেশের কাজ। নিশ্চয় করব। তবে এখন আমাকে ডোমনিথর্পি যেতে হচ্ছে।’

আঁতকে উঠল স্যার পার্সি, ‘কেন?’

ল্যান্ডলেডি মিসেস হাডসনকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আসব। ছোকরা চাকর বিলিকেও ছুটি দিয়েছি দেশে যাওয়ার জন্যে। লন্ডন আর নিরাপদ নয়। ওদের দুটো সিলিন্ডার নেমেছে সারে জেলায়। আমার বিশ্বাস, ফাঁকা জায়গায় নেমে ওরা আগে গুছিয়ে নেবে নিজেদের—তারপর পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম শহর লন্ডনে হানা দেবে।’

স্যার পার্সি সায় দিয়ে বলল, ‘ঠিকই বলেছ। এই জন্যেই বোধহয় সরকার এখান থেকে দপ্তর ওঠাচ্ছেন।’

‘ওঠাতেই হবে। কোথায় যাচ্ছে?’

‘বার্মিংহাম। হোমস, দেশের জন্যে, সমস্ত মানবজাতির জন্যে তোমার এখন লন্ডনেই থাকা দরকার। হালচাল দেখে প্ল্যান ঠিক করা দরকার। তুমিই হবে সরকারের লন্ডন পর্যবেক্ষক— এই নাও তার নিয়োগপত্র।’

নিয়োগপত্রে চোখ বুলিয়ে কপাল কুঁচকে হোমস বললে, ‘এ যে দেখছি বিরাট দায়িত্ব। ক্ষমতাও অসীম।’

‘তা তো বটেই।’

‘আমার দাদা মাইক্রফটকে বলো-না।’

‘তিনি রাজ পরিবারের সঙ্গে স্কটল্যান্ডে ব্যালোমোরল কাসলে চলে গেছেন। হোমস, তুমি ছাড়া এ দায়িত্ব নেওয়ার দ্বিতীয় লোক এ শহরে আর নেই।’

‘বুঝলাম। কিন্তু ডোমনিথর্পি আমাকে যেতেই হবে। ফিরে এসে দেখব মঙ্গলগ্রহীদের হালচাল।’

মাঝরাতের ট্রেনে ডোমনিথর্পি এসে পৌঁছলেন শার্লক হোমস মিসেস হাডসনকে নিয়ে। গাঁয়ের সরাইখানায় এখনও আলো জ্বলছে— দারুণ গুলতানি চলছে। গাঁয়ের জনা বারো মাতব্বর মিটিং করছেন অন্য গ্রহের আপদগুলোকে একহাত নেওয়ার ব্যাপারে।

খেতে খেতে শুনল হোমস সমবেত সিদ্ধান্ত। এখন যেখান থেকে পারো, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জড়ো হও— মারো মঙ্গলগ্রহীদের।

হাত তুলে বাধা দিল হোমস।

বলল, ‘বন্ধুগণ, উত্তেজিত হবেন না। সরকারের কামান বন্দুক হার মেনেছে যাদের কাছে— তাদের আপনারা গেঁইয়া হাতিয়ার নিয়ে আটকাতে পারবেন না। তা ছাড়া গুজব শুনছি ওরা নাকি নীল বিদ্যুৎ ছাড়াও এবার কালো রঙের ধোঁয়া ছাড়ছে— আড়ালে লুকিয়ে থেকেও যার বিষক্রিয়া থেকে রক্ষে নেই।’

‘তাহলে কী করতে বলেন?’ বললেন মোড়লমশাই।

‘চম্পট দিন। দেখলেই সরে পড়ুন— যদি প্রাণের মায়া থাকে।’

ঠিক এই সময়ে একটা টেলিগ্রাম এল হোমসের নামে। স্যার পার্সি পাঠিয়েছে বার্মিংহাম থেকে। সারে জেলা থেকে টেমস নদীর পাড় ধরে লন্ডন পৌঁছেছে মঙ্গলগ্রহীরা। সৈন্যরা কাতারে কাতারে শেষ হয়ে যাচ্ছে। মরেছে কত, সে হিসেবও পাওয়া যাচ্ছে না। সারে জেলাতে চতুর্থ চোঙা এসে পড়েছে।

ঘরে এসে টেলিগ্রামের জবাব লিখে পাঠাল হোমস। সাধু সাবধান! চারটে চোঙা এসেছে — আরও ছ-টা আসছে। চারটেই পড়েছে সারেতে— বাকি ক-টাও কোথায় পড়বে, সে হিসেবও নিশ্চয় মঙ্গলগ্রহীরা করে রেখেছে। ওরা ইংল্যান্ডের বিশেষ এক জায়গাতেই শক্তি

সংহত করছে মনে হচ্ছে। শুধু বুঝতে পারা যাচ্ছে না বাছাধনদের মতলবটা কী। মানুষ মেরে সাফ করতে চায়, না, টিকিয়ে রাখতে চায়।

টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থা করে রাতটা সরাইখানাতেই কাটাল হোমস। মিসেস হাডসন গেল নিজের বাড়িতে।

পরের দিন সকালে আরও খবর শোনা গেল সরাইখানার মালিকের মুখে। পঙ্গপালের মতো মানুষ ট্রেন-বোঝাই হয়ে লন্ডন থেকে চলে আসছে। সেখানে কালো ধোঁয়া ছাড়ছে মঙ্গলগ্রহের প্রাণীরা। ঘন ধোঁয়া বেশ ভারী। মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। নাকে গেলেই প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মঙ্গলগ্রহের চলন্ত মেশিনগুলোই আবার বাষ্প ছুড়ে কালো ধোঁয়াকে কালচে পাউডার বানিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে— তখন আর মানুষ মরছে না।

'যাক, তাহলে একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল,' বললে শার্লক হোমস। 'মঙ্গলগ্রহীরা মানুষ মেরে পৃথিবী সাফ করতে চায় না। রুখে দাঁড়ালে কিছু লোক মারছে— তারপর নিজেরাই ধোঁয়ার বিষক্রিয়া নষ্ট করে দিচ্ছে। সেইসঙ্গে আবিষ্কার করা গেল কালো ধোঁয়াকে দরকার মতো বাষ্প ছুড়ে নির্বিষ করারও পদ্ধতি।'

তৎক্ষণাৎ পোস্ট অফিসে গিয়ে টেলিগ্রামে পর্যবেক্ষণটা বার্মিংহামে স্যার পার্সির কাছে পাঠিয়ে দিল হোমস।

পরের দিন খবর এসে পৌঁছোলো কেম্ব্রিজ থেকে। এক রাতেই দুটো চোঙা অবতীর্ণ হয়েছে পৃথিবীতে। একটা সারে জেলাতেই আর একটা খাস লন্ডন শহরে— প্রিমরোজ পাহাড়ে।

খেতে খেতে এক ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করলেন এই ব্যাপারে। চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর একটা করে চোঙা ছিটকে এসেছে মঙ্গলগ্রহ থেকে। পৃথিবীতেও তাহলে চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর তাদের পৌঁছোনোর কথা। কিন্তু দুটো চোঙা একই রাতে এল কীভাবে?

হোমস বললে, 'মশায়, মঙ্গলগ্রহীদের এই চোঙাগুলোকে কামান থেকে ছোড়া গোলা বলে ভুল করবেন না। প্রতিটি চোঙা এক একটি মহাকাশযান। মহাশূন্যে নিজেদের গতি নিয়ন্ত্রণ, দিক পরিবর্তন এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবতরণের ক্ষমতা এদের আছে। তাই প্ল্যান মাফিক চোঙাগুলো কয়েক মাইল দূরে দূরে পড়ছে ইংল্যান্ডের একই অঞ্চলে।'

হাঁ করে শুনছিলেন ভদ্রলোক। দু-দিন আগে লন্ডন থেকে ইনিই প্রাণ হাতে করে পালিয়ে এসেছেন। লন্ডনে কালো ধোঁয়ার প্রতাপ স্বচক্ষে দেখেছেন, চলন্ত বয়লারের বিশাল

মেশিনদেরও দেখেছেন। দেখেছেন নীল বিদ্যুতের মতো মারাত্মক তাপরশ্মির ভয়াবহ লীলা।

তাই শার্লক হোমসের ব্যক্তিমে শুনলেন দু-চোখ বড় বড় করে। শোনবার পর বললেন, 'আপনি কি তাহলে বলছেন, কালো ধোঁয়া আর নীল বিদ্যুৎ দিয়ে হারামজাদারা শেষ করে ছাড়বে ইংল্যান্ডকে?'

হাসল হোমস। গরম খাবার মুখে তুলে চিবুতে চিবুতে বললে, 'এবার আসছে বোধহয় তৃতীয় অস্ত্র।'

'তৃতীয় অস্ত্র!'

'মাত্র চারটে চোঙার ভেলকি আমরা এতদিন দেখেছি— নীল বিদ্যুৎ প্রথমে, কালো ধোঁয়া তারপরে। আরও চোঙা আসছে— নামাচ্ছে আরও যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র যা প্রথমে আনা যায়নি। এবার সেইসব যন্ত্রপাতি, জোড়া লাগিয়ে তৃতীয় অস্ত্র বানানো কি অসম্ভব? এমন কোনও অস্ত্র যা কালো ধোঁয়া, নীল বিদ্যুৎ আর চলন্ত বয়লারদের চেয়েও দ্রুতগতি হবে— পুরো দেশটাকে আরও তাড়াতাড়ি কবজায় আনবে— তারপর সমস্ত পৃথিবীকে?'

খাবি খেতে খেতে লন্ডন থেকে পলাতক ভয়ার্ত ভদ্রলোক বললেন, 'মিস্টার হোমস, আপনি যেন ওদের অস্ত্রাগারটা এইমাত্র দেখে এসে কথা বলছেন। অথচ যা বলছেন, তা উড়িয়ে দেওয়ার মতো অযৌক্তিকও নয়। কী মনে হয় আপনার? তৃতীয় অস্ত্রটা কী মনে হয় আপনার? তৃতীয় অস্ত্রটা কী হতে পারে?'

'উড়ুক্কু মেশিন।'

'অসম্ভব।'

'অসম্ভব আমাদের কাছে— ওদের কাছে নয়। যারা এত লক্ষ মাইল অক্লেশে উড়ে এসে পৃথিবীতে আসন গেড়ে বসেছে— তাদের পক্ষে পৃথিবীর আকাশে উড়ুক্কু মেশিন উড়িয়ে দেওয়া এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়।'

লন্ডনগামী ট্রেনের একটা কামরায় দেখা গেল শার্লক হোমসকে এর পরের দিন। মাথায় চেক টুপি। গায়ে চেক কোট— যেন তদন্তে চলেছে।

ট্রেন ফাঁকা। লন্ডনের দিকে যাওয়ার লোক নেই ভলান্টিয়ার ছাড়া। শুকনো মুখে এদের একজন কেউ হোমসকে চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তদন্তে চললেন নাকি মিস্টার হোমস?'

হোমসও জবাবটা দিয়েছিল তক্ষুনি, ‘তদন্তই তো। বিশ্বের বৃহত্তম তদন্ত। বৃহত্তম ক্রাইম অনুষ্ঠিত হচ্ছে বহির্বিশ্ব থেকে— তারই তদন্ত।’

ভলান্টিয়ার ভদ্রলোকের প্রাণটা এমনিতেই গলায় এসে ঠেকেছিল নিদারুণ উৎকণ্ঠায়। হোমসের স্মিত মুখের রসিকতায় ভাষা খুঁজে পায়নি।

ট্রেন কিন্তু লন্ডন পৌঁছোনোর আগেই একটা ঘটনা ঘটল।

আচম্বিতে একটা ছায়া এসে পড়ল চলন্ত ট্রেন আর তার পাশে। উড়ন্ত কিছুর ছায়া। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল হোমস। তারপর তাকাল আকাশ পানে। চেয়ে রইল একদৃষ্টে। নিঃশঙ্ক চোখে তাঁর তৃতীয় অনুমানও সত্যি হল তাহলে।

উড়ুক্কু মেশিন

ঝকঝকে সাদা পিরিচের মতো একটা বস্তু উড়ে চলেছে ট্রেনের মাথায়। একবার নক্ষত্রবেগে সামনে ছুটে গিয়েই আবার পেছন দিক দিয়ে উড়ে এসে পুরো ট্রেনটির শেষ থেকে মাথা পর্যন্ত টহল দিয়ে গেল ধীর গতিতে। পরক্ষণেই কক্ষচ্যুত উল্কার মতো ছিটকে গেল লন্ডনের দিকে নিঃশব্দে।

ব্যাস, পরের স্টেশনেই ট্রেন গেল দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার ঘামতে ঘামতে নেমে এল ইঞ্জিন থেকে। তার ঘরে বউ-বাচ্চা আছে। উড়ুক্কু মেশিন যেদিকে গেছে, সেদিকে ট্রেন নিয়ে আর সে যাবে না।

ভয়ের চোটে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল বহু ভলান্টিয়ারেরই। ফিরতি ট্রেনে ওঠবার জন্যে হুড়োহুড়ি শুরু হতেই হাঁটা পথে লন্ডন রওনা হল শার্লক হোমস একা।

একদিন একরাত সমানে হেঁটে এবং সামান্য ক্ষণের পরিত্যক্ত বাড়িতে জিরিয়ে নিয়ে লন্ডন পৌঁছাল হোমস।

পৌঁছোল রাত্রে। লন্ডন তখন খাঁ-খাঁ করছে, মাঝে মাঝে ধাতুতে ধাতুতে ঠোকাঠুকির অপার্থিব আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অপার্থিব তো বটেই— পৃথিবীর কোনও ধাতুতে ওরকম কানফাটানো ঝংকার শোনা যায় না। নিশ্চয় চলন্ত বয়লার সদৃশ তিন পা-ওয়ালা মেশিন টহল দিচ্ছে পথেঘাটে। একবার একটা উঁচু বাড়ির ছাদের ওদিকে দেখা গেল এমনি একটা মেশিন। প্রায় একশো ফুট উঁচু। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফাঁকা দোকানে ঢুকে গা-ঢাকা দিল হোমস। যতই ডাকাবুকো হোক না কেন, খুনে মঙ্গলগ্রহীদের সঙ্গে চালাকি করতে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি এখন নয়। নিস্তব্ধ লন্ডন শহর মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে বাতাস ফালা ফালা করা স্টিম-সাইরেন জাতীয় ভয়াবহ আওয়াজে। যান্ত্রিক আওয়াজ! লন্ডন যারা মুঠোয় এনেছে তাদেরই সংকেত। এক মেশিন আরেক মেশিনকে সংকেতে জানাচ্ছে— সব ঠিক

হ্যায়। লন্ডনের দু-পেয়ে পোকাগুলো চম্পট দিয়েছে হে! রামভীতু সব। দেশটা এখন আমাদের! হাঃ হাঃ হাঃ!

হোমস কল্পনাপ্রবণ নয়। ভাবাবেগকে সে প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু সেই রাতে, আকাশে ঝুলন্ত বিবর্ণ চাঁদের ফ্যাকাশে আলোয় নিঝুম নিস্তব্ধ জনহীন পাথরপুরী লন্ডন শহরের বুকে আততায়ীদের সদর্প বিহার এবং গগনবিদারী উল্লাস-সংকেত শুনে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। মনে মনে ভাবল, ওয়াটসন থাকলে এই মুহূর্তে এই শ্মশানপুরীর ভয়াবহতা নিয়ে দু-পৃষ্ঠা লিখে ফেলত নিশ্চয়।

ওয়াটসন এখন কোথায়? অন্ধকারে গা ঢেকে বেকার স্ট্রিটের বাসাবাড়িতে পৌঁছোল হোমস। বাড়ি খালি। মেন্টলপিসের কাঠে ছুরি দিয়ে গাঁথা ওয়াটসনকে লেখা চিঠিখানা যেমন তেমনি পড়ে আছে।

বেঁচে আছে তো বন্ধুবর?

মনটা ভারি হয়ে এল হোমসের। আলো না জ্বালিয়ে কলতলায় গিয়ে জল পেল স্নান করার। দাড়ি কামিয়ে সাবান মেখে স্নান করে এসে বসল মিসেস হাডসনের রান্নাঘরে। শুকনো রুটি আর জল খেয়ে ওপরে উঠতে না উঠতেই টোকা পড়ল সদর দরজায়।

তখন নিশুতি রাত। খট খট খট করে কে যেন অতি সন্তর্পণে টোকা মারছে দরজায়।

পা টিপে টিপে নেমে গেল হোমস। দরজা খোলাই ছিল। ফাঁক দিয়ে দেখল— হপকিন্স। পুলিশ হপকিন্স। গায়ে শতচ্ছিন্ন কাদা-নোংরা পোশাক। চুল অবিন্যস্ত। দৃষ্টি বিভ্রান্ত।

পাল্লা খুলেই ঝট করে হপকিন্সকে ভেতরে টেনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল হোমস।

অস্ফুট চিৎকার করেই সামলে নিল হপকিন্স, 'মিস্টার হোমস, আপনি বেঁচে আছেন?'

'আছি এবং থাকব,' অসীম প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল হোমস, 'কিন্তু তুমি দরজায় টোকা মারছিলে কেন? সৌজন্য দেখানোর সময় নাকি এখন?'

'অভ্যেস, মিস্টার হোমস, তা ছাড়া মাথার ঠিক নেই আমার। যা দেখে এলাম—' বলতে বলতে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল হপকিন্স।

আধো অন্ধকারেই হপকিন্সের মুখচ্ছবি দেখে ব্যাপারটা আঁচ করে নিল হোমস। নার্ভাস শক।

দেরাজ থেকে ব্রান্ডির বোতল এনে এক গেলাস খাইয়ে দিল বিধ্বস্ত পুলিশ ইন্সপেক্টরকে, পান করল নিজেও।

তারপর চেয়ারে বসিয়ে বলল, ‘বলো, কী দেখেছ।’

‘দেখেছি ওদের... কালো ধোঁয়া, নীল বিদ্যুৎ, চলন্ত বয়লার, উড়ুক্কু মেশিন।’

‘ওসব আমিও দেখেছি, হপকিন্স। কিন্তু তুমি তো দেখছি সমুদ্রপাড়েও গেছিলে।’

চোখ কপালে তুলে হপকিন্স বললে, ‘আপনি কী করে জানলেন?’

‘তোমার জামাকাপড়ে সমুদ্রের ফেনা শুকিয়ে রয়েছে দেখে।’

‘হ্যাঁ, গেছিলাম মিস্টার হোমস। তাড়া খেয়ে গেছিলাম। তিনদিক থেকে চলন্ত বয়লারগুলো মানুষগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল পূর্বদিকে— যেদিকে সমুদ্র। আমি একটা সাইকেল জোগাড় করে প্রাণের ভয়ে সেইদিকেই গেছিলাম। সৈন্যরা যেখানে কামান ছুড়েছে, সেখানে ওরা কালো ধোঁয়া ছুড়ে দলকে-দল খতম করে দিয়েছে। ভীষণ ভারী কালো ধোঁয়া, মিস্টার হোমস, অনেকটা তরল পদার্থের মতো। মানুষ সমান হাইটে মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়— তারপর ঝুরঝুর করে ঝরে গিয়ে ভুষোর মতো মাটি লেপটে থাকে— তখন আর কোনও ক্ষতি হয় না। আমরা পালাচ্ছিলাম বলে কালো ধোঁয়া আমাদের দিকে ছোড়া হয়নি। পালিয়ে যখন সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছোলাম, তখন দেখলাম কতকগুলো জাহাজে পালে পালে লোক উঠছে। দূরে দূরে চলন্ত বয়লারগুলো দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। কিছু করছে না। মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে সাদা পিরিচের মতো উড়ুক্কু মেশিন উড়ে যাচ্ছে। জাহাজ মাত্র কয়েকটা, কিন্তু লোকের শেষ নেই। তার ওপর মূর্তিমান যমদূতের মতো চলন্ত বয়লারদের দাঁড়িয়ে থাকা। চেঁচামেচি হট্টগোলের মধ্যে মুরগিঠাসার মতো মানুষঠাসা হয়ে দুটো জাহাজ যেই জেটি ছেড়েছে, অমনি তিনটে চলন্ত বয়লার এগিয়ে গিয়েছিল জেটির ওপর দিয়ে জলের ধারে। ঠিক তখনই জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকা একটা যুদ্ধজাহাজ থেকে পর পর তিনবার কামান দেগে দুটো বয়লারকে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিতেই ঘটল বিপর্যয়। চক্ষের নিমেষে মাথার ওপর উড়ে এল একটা উড়ুক্কু মেশিন— কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে গেল যুদ্ধ জাহাজের ওপর। নিস্তব্ধ হয়ে গেল জাহাজ। একই সঙ্গে জেটি ছেড়ে যাওয়া জাহাজ দুটোকে লক্ষ করে বার কয়েক নীল বিদ্যুৎ ছুড়ল তৃতীয় বয়লারটা। দুটো জাহাজই সঙ্গে সঙ্গে জ্বলতে জ্বলতে ডুবে গেল জলে। মিস্টার হোমস, ভয়াবহ সেই দৃশ্য দেখে আমি যেন কীরকম হয়ে গেলাম। মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। কীভাবে সাইকেল চালিয়ে হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে চলে এলাম, নিজেও ভালো করে জানি না। এইখানে এসে বিটের কনস্টেবলদের মতো ওই একশো

ফুট উঁচু মেশিনগুলোর চোখ এড়িয়ে বেকার স্ট্রিটে আসতেই আপনার কথা মনে পড়ে গেল। বিপদে-আপদে সব সময়েই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি— মুখে স্বীকার না করলেও আপনার কৃপায় মান-যশ পেয়েছি। আর আজ এসেছি শুধু প্রাণটা বাঁচাতে। মিস্টার হোমস, লন্ডন তো শেষ— মানুষ জাতটাও কি শেষ হতে চলেছে?'

জলদগম্ভীর স্বরে হোমস বললে, 'না, হপকিন্স, তোমার ছবির মতো বর্ণনা থেকেই আমার আগের অনুমানটা সত্যি বলে প্রমাণিত হল। এরা মানুষকে মারতে চায় না— জিইয়ে রাখতে চায়। এক জায়গায় জড়ো করে রাখতে চায়। কেন, সে প্রশ্নের জবাব খুঁজতেই এসেছি আমি লন্ডনে।' হোমসের প্রত্যয়-কঠিন ধীরস্থির কণ্ঠস্বর আর অসীম আত্মবিশ্বাস সংবিৎ ফিরিয়ে আনল অস্থির-স্নায়ু হপকিন্সের। হোমসই তাকে এর পর সাবান দিল, স্নানের জল দিল, খাবার দিল। স্নান করে, খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল হপকিন্স।

তখন ভোরের আলো ফুটছে। বেকার স্ট্রিটে এসে দাঁড়াল হোমস। গেল উলটোদিকে ক্যামডেন হাউসে। কর্নেল সিবাস্টিয়ান মোরানের গ্রেপ্তারের পর থেকে এ-বাড়িতে আর ভাড়াটে আসে না। দরজা খোলা। সটান চিলেকোঠায় উঠে গেল হোমস। দেখল জনহীন লন্ডন নগরীকে। একদা যে নগরীর পথঘাট গমগম করত লোকজন গাড়িঘোড়ায়— এখন তা নিস্তব্ধ। কোথাও গাড়ি চলছে না— লোক হাঁটছে না। যেন দুরন্ত প্লেগের আক্রমণে মৃত নগরীতে পরিণত হয়েছে প্রাণচঞ্চল লন্ডন। রিজেন্ট পার্কের সবুজ গাছগুলো কেবল মাথা তুলে বিষণ্ণভাবে দেখছে বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা নিষ্প্রাণ নগরীকে— পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম নগরীকে। এই সেদিনও এর আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে থাকত হাজার হাজার চিমনির ধোঁয়ায়। এখন কেবল চিমনিগুলোই আছে, ধোঁয়া নেই। আকাশ-বাতাস পরিষ্কার। দু-মাইল দূরে প্রিমরোজ পাহাড়ে ভোরের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। চকচকে ধাতুতে। টহল দিচ্ছে চলন্ত বয়লার— মঙ্গলগ্রহীদের মেশিনসান্ত্রি নেই, কেউ কোথাও নেই। সৈন্যসামন্ত, রাজা-প্রজা গেরস্ত-ডাকাত, দ্বিপদ-চতুষ্পদ— সব পালিয়েছে! মরেছে। অজেয় লন্ডন আজ সম্পূর্ণ পরাভূত। লুণ্ঠিত।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নেমে এল হোমস। রাস্তা পেরিয়ে নিঃশব্দ চরণে ঢুকল বেকার স্ট্রিটের বাসায়।

দূরে স্টিম সাইরেনের শব্দে যান্ত্রিক সংকেত শোনা গেল ঠিক সেই সময়ে।

খাঁচায় মানুষ কেন

ডোমনিথর্পি থেকে হোমস ফিরে আসার আগেই লন্ডন অঞ্চলে সাতটা চোঙা অবতীর্ণ হয়েছিল, খুব সম্ভব বেস্পতিবার মধ্যরাত্রে পৌঁছেছে অষ্টম সিলিন্ডার— আগের সাতটার কাছাকাছি তো বটেই। তার মানে আর বাকি রইল মাত্র দুটো। মোট দশটি চোঙার পঞ্চাশজন মঙ্গলগ্রহী একত্র হয়ে অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করবার পর কী কাণ্ড শুরু হবে পৃথিবীর বুকে, ভাবতেই গা শিরশির করে উঠল শার্লক হোমসের মতো শক্ত ধাতের মানুষেরও। নীল বিদ্যুতের উত্তাপ আর কালো ধোঁয়ার ধ্বংসলীলা তো এর মধ্যেই সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর বুকে। এর পরেও যদি নয়া হাতিয়ারের আবির্ভাব ঘটে, তাহলে আর রক্ষা নেই।

রেহাই পাওয়া যাবে যদি আততায়ীদের অস্ত্রের আর খাদ্যের ভাণ্ডার শূন্য হয়— মঙ্গলগ্রহের ঘাঁটি থেকে সরবরাহ না এসে পৌঁছায়।

কিন্তু সে সম্ভাবনা আছে কী? এই হামলার কারণটা যদি সঠিকভাবে জানা যেত, ওদের উদ্দেশ্যটা যদি আঁচ করা যেত— তাহলে সব প্রশ্নেরই সদুত্তর পাওয়া যেত। দুপুর নাগাদ আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে উঠল হপকিন্স। শরীর ঝরঝরে। মাথাও সুস্থ। সমুদ্রতীরে যা কিছু দেখে এসেছে, তার আরও নিখুঁত বর্ণনাও দিতে পারছে।

বললে, 'মিস্টার হোমস, ওরা কিন্তু কালো ধোঁয়া দিয়ে ইচ্ছে করলেই সবাইকেই মারতে পারত। মারল না। শুধু যারা ওদের ক্ষতি করেছে, তাদের শেষ করে দিয়েছে। বাকি সবাইকে—'

বলেই থেমে গেল হপকিন্স। চোখের তারায় ফুটে উঠল কুহেলি।

হোমস বললে, 'থামলে কেন?'

'মিস্টার হোমস, বাকি সবাই তাড়া খেয়ে যখন এক জায়গায় জড়ো হয়ে বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে, তখন তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে শুঁড়ে করে ধরে খাঁচায় পুরে

রাখল।’

‘খাঁচায়!’

‘হ্যাঁ। চলন্ত বয়লারদের পিঠে বিরাট খাঁচার মধ্যে জ্যান্ত মানুষ অনেক দেখেছি। এই দেখেই সাইকেল চালিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। মিস্টার হোমস, ওরা মানুষ খাঁচায় রাখছে কেন?’

গুম হয়ে রইল হোমস। তারপর বললে, ‘খাবার জন্যে নয় তো?’

‘খাবার জন্যে। মানুষ কি খাবার?’

‘মানুষের কাছে ইতর প্রাণীরা যেমন খাদ্য, ওদের কাছে মানুষের মতো ইতর প্রাণীরাও — তেমনি খাদ্য হতে পারে তো!’

‘আমরা কি জন্তু!’ হপকিন্স যেন বিলক্ষণ অপমানিত।

‘শাকসবজি অথবা ইটপাথরও তো নই— জ্যান্ত জীব। সুতরাং...’ বাকিটা আর মুখ ফুটে বলল না হোমস।

রাতের অন্ধকারে শুকনো রুটি ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায়নি হোমস, কিন্তু এখন দিনের আলোয় জ্যাম জেলি বিস্কুট পেল এন্তার। মিসেস হাডসন সব গুছিয়ে রেখে গেছে শার্লক হোমসের ফিরে আসার কথা ভেবে।

সুতরাং খাওয়াটা মন্দ হল না। হালকা মদও পাওয়া গেল খাবার আলমারিতে। মনটা তরতাজা করে দুজনে বেরুল রাস্তায়। প্রথমে অবশ্য জানলা দিয়ে মুন্ডু গলিয়ে দেখে নিল রাস্তায় একশো ফুট লম্বা তালঢ্যাঙা মেটাল দানবরা ঘুরছে কি না। রাস্তার দু-পাশ খাঁ-খাঁ করছে দেখে পেরুল চৌকাঠ। নিস্তব্ধ পথ পেরিয়ে হাইড পার্কের মধ্যে দিয়ে গেল কেনসিংটন গার্ডেনে। একটা লম্বা গাছের মগডাল পর্যন্ত উঠল হপকিন্স। নেমে এসে বললে, মাইল কয়েক দূরে প্রিমরোজ হিলে তিনটে যন্ত্রদানবকে দেখা যাচ্ছে।

আবার শুরু হল পথ পরিক্রমা। কিছু দূরে একটা নালার পাড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল হোমস। অপলকে চেয়ে রইল নালার পানে।

হপকিন্স দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল, অদ্ভুত লাল ফুলে ছেয়ে গেছে নালার জল। অনেকটা কচুরিপানার মতো গড়ন। কিন্তু রঙটা এই সবুজ পৃথিবীর পাতার মতো নয়— লাল।

বিড়বিড় করে বললে হোমস, ‘রক্তরাঙা গ্রহের ফুল মনে হচ্ছে।’

সভয়ে অদ্ভুত দর্শন ফুলগুলোর পানে চেয়ে থেকে হপকিন্সও বললে যন্ত্রচালিতের মতো, ‘তা-ই তো মনে হচ্ছে। লন্ডন শহর চষে ফেলেছি মিস্টার হোমস। এরকম বিকট ফুল তো কোথাও দেখিনি। তা ছাড়া রংটা...’

‘হ্যাঁ, লাল গ্রহ মঙ্গলের রংই বটে। হপকিন্স, মঙ্গলের প্রাণীরা নিজেদের গ্রহের ফুল ফল দিয়ে নতুন বাড়ি সাজাতে আরম্ভ করে দিয়েছে এরই মধ্যে।’

‘যেমন আমরা নতুন বাড়ি সাজাই।’

‘হ্যাঁ। কিন্তু...’ হেঁট হল হোমস। লাল ফুলের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে বললে, ‘কিছু পাতা বাদামি হয়ে এসেছে। ঝরে যাচ্ছে। প্রাণের চিহ্ন মুছে যাচ্ছে— এর মধ্যে! কেন, হপকিন্স, কেন?’

বলতে বলতে লম্বা হাত বাড়িয়ে পটাং করে একটা বিবর্ণ পাতা ছিঁড়ে এনে চোখের সামনে মেলে ধরল হোমস। তারপর পকেট থেকে আতস কাচ বার করে খুঁটিয়ে দেখল পাতার শিরা-উপশিরা। শেষকালে আতস কাচ পকেটস্থ করে বললে চাপা উত্তেজনায়, ‘হপকিন্স আমার অনুমানই ঠিক। পাতাটার মৃত্যু হচ্ছে।’

অবাক হয়ে হপকিন্স বললে, ‘কিন্তু এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, মিস্টার হোমস? জন্মালে সবাই মরে—’

‘বাঃ, গীতার বাণী মুখস্ত করে ফেলেছ দেখছি। অমর কেউ নয়— ঠিক কথা। জন্মালে মরতেই হবে। কিন্তু হপকিন্স, এত তাড়াতাড়ি কেন? এই তো সেদিন মঙ্গলের প্রাণীরা নেমেছে পৃথিবীতে, সে গ্রহে যে গাছপালা আছে তাদের বীজও ছড়িয়েছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তাদের মৃত্যুর কারণটা কি কল্পনাও করতে পারছ না?’

ঢোঁক গিলে হপকিন্স বললে, ‘আজ্ঞে না।’

‘ইডিয়ট,’ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে হোমস, ‘দুই গ্রহের জল হাওয়া দু-রকম। ওখানে যা বাঁচে, এখানে তা মরে। ওখানকার পরিবেশ যাদের কাছে স্বাস্থ্যকর, এখানকার পরিবেশ তাদের কাছে অস্বাস্থ্যকর। হে হাঁদারাম হপকিন্স, এই কারণেই ওখানকার ফুল এখানে পটল তুলছে। কে জানে, কে জানে...’ প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে নিরুদ্ধনিশ্বাসে বললে হোমস, ‘কে জানে মৃত্যুর সমাপ্তি এবার অজেয় মঙ্গলগ্রহীদের কুপোকাত করবে কি না!’

চোয়াল ঝুলে পড়ল হপকিন্সের। সত্যি সত্যিই ঝুলতে লাগল বুকের ওপর। হাঁ হয়ে গেল মুখটা। চিরটা কাল এমনিভাবে চোখ খোলা রেখে অনেক জটিল রহস্যের সহজ সমাধান

দেখিয়ে পুলিশ এবং জনসাধারণের মুণ্ড ঘুরিয়ে দিয়েছে শার্লক হোমস। এবারও, ভিনগ্রহী দস্যুদের করাল আক্রমণেরও সমাপ্তি সূচনা কি ধ্বনিত হল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অপরাধ-বিজ্ঞানীর কণ্ঠে?

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল হপকিন্স। চোয়ালটা অবশ্য ঝুলতে লাগল আগের মতোই।

হোমস ততক্ষণে একটা পরিত্যক্ত দোকানে ঢুকে নোট বইয়ের পাতায় পাতায়, খসখস করে কী যেন লিখে চলেছে আপন মনে। একপৃষ্ঠা... দু-পৃষ্ঠা তিন পৃষ্ঠা। লেখা শেষ। পাতা ছিঁড়ে ভাঁজ করে হপকিন্সকে ডাকল হোমস।

বললে, 'হপকিন্স, একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তোমাকে দিচ্ছি। এই কাগজ ক-খানার মধ্যে যা লিখে দিলাম তা অতিশয় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলে জানবে। মিলিটারি দপ্তর এই কাগজের লেখা তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলগ্রহীদের বিরুদ্ধে রণনীতি নির্ধারণ করতে পারেন। মঙ্গলগ্রহীরা কী খায়, এখনও সঠিক জানা যায়নি। মানুষ খায় কি না, সেটা পরে প্রমাণিত হবে-খন। আপাতত তোমার খাদ্যের দরকার। এই দোকানে প্রচুর বিস্কুট আর টিনে খাবার আছে। পকেট ভরতি করে নিয়ে রওনা হও বার্মিংহামের দিকে।'

টপ করে চোয়াল বন্ধ করে হপকিন্স। বললে, কাতর কণ্ঠে, 'বার্মিংহাম!'

'অত আঁতকে ওঠার কী আছে?'

'একশো মাইলেরও বেশি পথ— হেঁটে যাব?'

'লন্ডনের বাইরে একবার গিয়ে পড়লে পথেঘাটে ঘোড়া কি অন্য যানবাহন পেয়ে যাবে। সে ভাবনা তোমার। কিন্তু বার্মিংহাম তোমাকে যেতেই হবে— এই চিরকুট নিয়ে।'

'আর আপনি? এই ভয়ংকরদের মধ্যে থাকবেন?'

'হপকিন্স, থাকতে আমাকে হবেই। এদের মধ্যে থেকে এদেরই ত্রুটি অন্বেষণ করতে হবে— প্রাণ হাতে নিয়ে সেই কাজই করে যাব দেশের স্বার্থে— পৃথিবীর স্বার্থে।'

এরপর তার কথা বলা চলে না। হপকিন্স প্যান্টের আর কোর্টের পকেটে বেশ কিছু টিনের খাবার ঠেসে নিয়ে শুকনো মুখে রওনা হল বার্মিংহাম অভিমুখে।

শার্লক হোমস বেরোল রোদে। জনহীন লন্ডন শহরের পথেঘাটে অতি সন্তর্পণে চোরের মতো ঘুরতে লাগল নতুন সূত্রের আশায়।

একটা সূত্র অবশ্য পাওয়া গেছে। মোক্ষম সূত্র।

লাল ফুলেদের মৃত্যু। পৃথিবীর হাওয়ায় তাদের জন্মেই মরণের কোলে ঢলে পড়া। মঙ্গলের প্রাণ যখন পৃথিবীতে এসে নিষ্প্রাণ হয়ে যায় তখন...

আচমকা সজাগ হল শার্লক হোমস। রাস্তার মোড়ে দেখা গেল একটি নরদেহ। হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ। টলতে টলতে আসছে এইদিকেই।

সাঁৎ করে পাশের মনোহারী দোকানে ঢুকে পড়ল হোমস। বিরাট দোকান। কাচের শো-কেসের পর শো-কেস। থরে থরে সাজানো টিনের খাবার, প্রসাধন দ্রব্য এবং বিবিধ সামগ্রী।

ফুটপাথ থেকে পায়ে পায়ে পিছু হটে এসে এই দোকানের ভেতরেই এসে দাঁড়াল হোমস।

কিন্তু উৎকর্ণ কর্ণরন্ধ্রে ভেসে এল দ্রুত ধাবমান পদশব্দ। কৃপাণ হাতে টলায়মান পুরুষটি ছুটে আসছে এইদিকেই। মুহূর্তের মধ্যে খোলা দরজার সামনে আবির্ভূত হল সে। কৃপাণ উঁচিয়ে বললে শ্লেষ্মা জড়িত ঘড়ঘড়ে গলায়, 'শার্লক হোমস। এবার তোমাকে একা পেয়েছি...'

আরও কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সকৌতুকে বললে শার্লক হোমস, 'মর্স হাডসন যে। আমি তো ভেবেছিলাম আমি একাই বুঝি রইলাম পড়ে পুরোনো এই শহরে। বড্ড একা লাগছিল। বাঁচলাম তোমাকে পেয়ে।'

'বাঁচাচ্ছি, শয়তান কোথাকার।' চৌকাঠ পেরিয়ে আরও দু-পা ভেতরে অগ্রসর হল হাডসন, 'মার্থা হাডসন কোথায়?'

দু-পা পিছিয়ে গিয়ে একটা টুলের পাশে দাঁড়িয়ে হোমস বললে, 'মার্থা? মানে, মিসেস হাডসন? আমার ল্যান্ডলেডি?'

'হ্যাঁ রে রাসকেল! আমার বিয়ে করা বউ। কোথায় সে?'

'ব্রাদার হাডসন, ছ-জন নেপোলিয়নের মূর্তি নিয়ে যে কেলোর কীর্তি হয়েছিল, তোমার শ্রীঘর অনিবার্য ছিল সেই কেসে। এখনও দেখছি তোমার আক্কেল হয়নি। রাসকেল বলাটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'শয়তান! বল কোথায় রেখেছিস মার্থাকে? কাল থেকে দেখছি তোকে— সঙ্গে ছিল ওই ন্যাওটা হপকিন্সটা। আজ তোকে পেয়েছি একা, বল— কোথায় রেখেছিস মার্থাকে?'

'হাডসন, মিসেস হাডসন তোমার বিয়ে করা বউ ঠিকই, কিন্তু ফেলে পালানো বউ। পুলিশের ভয়ে তুমি নিরপরাধিনী মেয়েটাকে অনাহারে রেখে গা-ঢাকা দিয়েছিলে, আমিই তাকে লন্ডনে এনে বাড়ি কিনে ল্যান্ডলেডি বানাই— বাড়ি ভাড়ার টাকায় যাতে সংসার চলে যায়, তাই ওপরতলাটা ভাড়াও নিই ওয়াটসনের সঙ্গে। কিন্তু কাকপক্ষী এই বদান্যতার কথা জানে না—'

'আমি জানি, কুত্তার বাচ্চা। নিকুচি করেছে তোর বদান্যতার। বল কোথায় ফের লুকিয়েছিস মার্থাকে?'

'খুব ভাল জায়গায়। যেখানে তোমার মতো নচ্ছার কেন— মঙ্গলগ্রহীদের ওই যন্ত্রদানবও পৌঁছোতে পারবে না।'

'কোথায়?'

'বলব না।'

'না বললে মরবি।'

'মরলেও ঠিকানা পাবে না।'

'তবুও মর!' বলেই ক্ষিপ্রবেগে ফিরে এসে হোমসের মাথা লক্ষ করে কৃপাণ চালাল হাডসন।

হোমসও তৈরি ছিল। পলক ফেলার আগেই পাশের টুল হাতে উঠে এল এবং কৃপাণটা ঘ্যাঁচাৎ করে বসে গেল টুলের কাঠে।

হাডসনের শ্লেষ্মা-ঝরা মুখের কাছ থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে মোলায়েম গলায় হোমস বললে, 'বড় সর্দি লেগেছে দেখছি।'

এক হ্যাঁচকায় কৃপাণ ছাড়িয়ে নিয়ে আবার হোমসের মাথা লক্ষ করে কোপ মারল হাডসন। এবার কিন্তু পিচ্ছিল ভঙ্গিমায় একপাশে সরে গিয়ে হোমস শুধু বললে, 'অত চেঁচিও না, মঙ্গলগ্রহের শান্ত্রীরা শুনতে পাবে।'

হোমসের প্রখর কর্ণযন্ত্র আগেই যা শ্রবণ করেছিল এখন তা স্পষ্টই শোনা গেল কথা শেষ হতে না হতে। ঝনাৎ... ঝন... ঝন... ঝনাৎ... ঝন... ঝন।

ধাতুতে ধাতু ঠুকে কারা যেন এগিয়ে আসছে এই দিকে।

চাপা গলায় হোমস বললে, 'নির্বোধ কোথাকার! কৃপাণ উঁচিয়ে বেপরোয়াভাবে ধেয়ে এসেছিলে যখন, তখনই তোমাকে দেখেছে ওরা। এখনও চেঁচাচ্ছ ষাঁড়ের মতো গাঁকগাঁক

করে!...’

‘শাট আপ!’ গলার শির তুলে চেঁচিয়ে উঠে হোমসকে লক্ষ করে ছুটে এল হাডসন। বিদ্যুৎগতিতে হোমস একটা শো-কেস থেকে আরেকটা শো-কেসের আড়ালে সরে গেল বলেই রক্ষে, নইলে কচুকাটা হয়ে যেতে হত হাডসনের মুহুর্মুহু কৃপাণ চালনায়। কৃপাণ আঘাতে ঝনঝন করে গুঁড়িয়ে গেল একটা শো-কেস।

ঝনাৎ ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দটা স্তব্ধ হল দোকানের ঠিক সামনেই। বিশাল বয়লার সদৃশ যন্ত্রদেহ হেঁট হল দোকানের অভ্যন্তরের দৃশ্য ভালোভাবে দেখবার জন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অজগরের মতো একটা মোটা শুঁড় ধেয়ে এল ভেতরে।

হাডসন অশ্লীল গালাগালি দিয়ে কৃপাণ চালাল সেই শুঁড় লক্ষ করে— ঠনাৎ শব্দে ধাতব শুঁড়ে কৃপাণ লেগেই হাত থেকে ঠিকরে গেল শূন্যে এবং চোখের পলক ফেলার আগেই শুঁড়টা ঠিক অজগরের মতোই হাডসনকে পেঁচিয়ে ধরে অবলীলাক্রমে তুলে নিল শূন্যে এবং শূন্যেই একবার দুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

হাডসনের বিকৃত আর্তনাদ শোনবার জন্যে কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল না হোমস। হাতের কাছে খাবারদাবার যা পেল ঝটপট পকেটে পুরে সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল পেছনের দরজা দিয়ে। সেখান থেকে একটা সরু গলি দিয়ে পেছনের রাস্তায় যেতে যেতেই পেছন ফিরে দেখতে পেল শুঁড়টা দোকান থেকে শো-কেস ভেঙে টিনের খাবার লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে বাইরে। রাস্তায় বেরিয়ে আসতে না আসতেই প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ল বাড়ির সামনের দিকটা। যন্ত্রদানবের ধাক্কা বোধহয় সইতে পারল না।

হোমস তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছে। এ-রাস্তা সে-রাস্তা হয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে শুনতে পেল হাডসনের বিকট আর্তনাদ আর ধাতব ঝনৎকার।

দূরের মোড় ঘুরে অদৃশ্য হল একটা দানব দেহ। পিঠের খাঁচায় আকুলিবিকুলি করছে মর্স হাডসন। আর ডাকছে পরিত্রাহি স্বরে, ‘হোমস! হোমস! হোমস!’

শুষ্ক কঠিন চোখে নিষ্পলকে চেয়ে রইল শার্লক হোমস।

মানুষ নিয়ে কোথায় চলেছে মঙ্গলগ্রহী? ল্যাবরেটরিতে গিনিপিগের মতো কেটেকুটে এক্সপেরিমেন্টের জন্য? না রান্নাঘরে?

অদৃশ্য সেনানী

পরের দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই আগে ছাদে গিয়ে লন্ডনের অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে নিল হোমস। চারদিক থমথম করছে। পাখিগুলো পর্যন্ত যেন বুঝেছে এ শহর তার পার্থিব জীবেদের কবলে নেই— মহাপাপিষ্ঠ অপার্থিবরা নারকীয় তাণ্ডবে মত্ত হয়েছে পথেঘাটে এমনকী আকাশেও। কাজেই আকাশবিহার স্থগিত রেখে বৃক্ষশাখার বাসায় টু-লেট ঝুলিয়ে বিহঙ্গকুল পর্যন্ত চম্পট দিয়েছে।

অথবা, থেকেও বোবা হয়ে রয়েছে— বিষম আতঙ্কে। অবাক মানসগোচর সত্তা দিয়ে তারাও বুঝেছে, ভিনগ্রহী এই আতঙ্কদের কাছে পৃথিবীর সব জীবই শত্রু।

তাই, ভোরের লন্ডন শুধু ধূমহীন নির্মল নয়— নীরব নিস্তব্ধ। সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে পাখিরা বিরামবিহীন যে গান গেয়ে ঘুম ভাঙিয়েছে মানব সমাজের— সে গান আর শোনা যাচ্ছে না।

এরই নাম কি মহাশ্মশান?

দু-চোখ বুঝি সজল হয়ে এল শার্লক হোমসের।

আচম্বিতে প্রিমরোজ হিলের দিক থেকে ধাতব কণ্ঠস্বরে নৈঃশব্দ্য খানখান করে দিয়ে রণনিনাদ ছাড়ল একটা মেটাল দৈত্য। ভোরের সূর্যও ঠিকরে গেল ধাতব দেহ থেকে। স্টিম সাইরেনের মতো কানের পর্দা ফাটানো তীব্র শব্দও শোনা গেল দিকে দিকে। কিন্তু—

অত্যন্ত সজাগ এবং প্রখর শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিকারী বলেই শার্লক হোমসের মনে হল, এই জয়ধ্বনি যেন আগের শোনা জয়ধ্বনির মতো নয়, বেহালার মূর্ছনা যাকে অভিভূত করে, সুরের ইন্দ্রজাল যে সূক্ষ্ম সত্তা দিয়ে অনুভব করে— সেই শার্লক হোমসের কানে এটুকু তারতম্য ধরা পড়া একান্তই স্বাভাবিক।

তাই খটকা লাগল হোমসের মনে।

সারা দিনে মাঝে মাঝে শোনা গেল দূরায়ত স্টিম সাইরেনের ধ্বনি। ধাতুর বুক চিরে যেন বেরিয়ে আসছে সেই শব্দ। কিন্তু সঞ্চরমান কোনও ধাতব দানবকে দেখা গেল না দিগন্তের কোনওদিকেই, সন্ধে নাগাদ গোধূলির রক্তিমাভায় একবার কেবল ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা ধাতব দেহ প্রিমরোজ হিলের ওপর।

রাত নামল। বাতি জ্বালল না হোমস। বরং বেহালা নামিয়ে খুব আলতো করে টেনে বিচিত্র সুরের জাল বুনে চলল আপন মনে।

রোববার সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে মনে পড়ল, দশম চোঙা কাল রাতেই নেমেছে পৃথিবীতে— নিশ্চয় লন্ডনেরই ধারেকাছে। ওদের বাহিনী এখন সম্পূর্ণ। পঞ্চাশজন মঙ্গলগ্রহী তাদের সমস্ত সাজসরঞ্জাম নিয়ে হাজির লন্ডনে। সে তুলনায় কিন্তু সাজ সাজ রব শোনা যাচ্ছে না আকাশে-বাতাসে অথবা, পথেঘাটে। লন্ডন আরও ঝিমিয়ে পড়ছে। শার্লক হোমসও কি ঝিমিয়ে পড়ছে? চোখ গেল ম্যান্টলপিসে রাখা কোকেন মারফিনের শিশি আর হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের দিকে। নিজেকে নিস্তেজ মনে করলেই, বাইরের উত্তেজনার অভাব দেখা দিলেই রক্তের মধ্যে ছুঁচ দিয়ে মাদক দ্রব্য মিশিয়ে কৃত্রিম উত্তেজনার সৃষ্টি করে এসেছে হোমস এতকাল, কিন্তু এখন আর তার দরকার নেই। লন্ডন ঝিমিয়ে পড়ে পড়ুক, শার্লক হোমস ঝিমিয়ে নেই।

রাস্তায় বেরোল হোমস। বেকার স্ট্রিট খাঁ-খাঁ করছে। সাবধানে মোড় ঘুরে অলিগলি দিয়ে পৌঁছল রিজেন্ট পার্কে, একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় কী যেন পড়ে আছে। ধাতব দেহ। দূর থেকে দেখেই থমকে গেল হোমস।

আর ঠিক তখনই ভক করে খানিকটা সবুজ ধোঁয়া ঠেলে উঠল গাছের ফাঁক দিয়ে— ঠিক যেমনটা দেখা গিয়েছিল ওকিং-এ নীল বিদ্যুৎ নিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্তে।

কাঠ হয়ে গেল হোমস।

কিন্তু পলায়নের আগেই শোনা গেল অদ্ভুত সেই চিৎকারটা।

পার্থিব ভাষায় যার নাম গোঙানি, এ যেন তার চাইতেও তীব্র কিছু। ধাতুর বুক চিরে বেরোনো শব্দ নয়, স্টিম সাইরেনের মতো বুকের রক্ত ছলকানো শব্দও নয়। এ শব্দ যেন প্রাণীর।

হ্যাঁ, কোনও সন্দেহই নেই। জীবন্ত প্রাণীর কণ্ঠ নিঃসৃত সেই চিৎকার, আর যা-ই হোক বিজয়োল্লাস নেই— আছে যেন অন্তিম হাহাকার। শব্দটা একবার শোনা গেল— দু-বার

শোনা গেল। তৃতীয়বার শব্দ নয়— ভক করে আবার সেই সবুজ ধোঁয়া লুণ্ঠিত ধাতব দেহের ওপরে ঠিকরে গেল— দেহটা কিন্তু নড়ল না।

মেশিন পড়ে রইল গাছের তলায়।

দ্রুত পেছনে সরে এল হোমস। তারপর পেছন ফিরেই পিঠটান দিয়ে গলির মধ্যে।

পেছন থেকে অপার্থিব কণ্ঠে কেউ হুংকার দিল না, রক্ত হিম করা ধাতব নিনাদে হৃৎপিণ্ড অসাড় করে দিল না। একরকম ছুটতে ছুটতে বেকার স্ট্রিটে বাসায় ফিরে হোমস জল গরম করে চা বানিয়ে বিস্কুট দিয়ে দুপুরের খাওয়া শেষ করে ভাবতে বসলেন সকাল বেলাকার দেখা দৃশ্যটা নিয়ে। তবে কি তার অনুমানই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল? ধুঁকতে শুরু করেছে মঙ্গলের আগন্তুকরা? লাল ফুল মরে বাদামি হয়ে যাচ্ছে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল হোমসের। সেই তার প্রথম সূত্র। সেই সূত্রের বশেই শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার পথনির্দেশ পাঠিয়েছিল বার্মিংহামে। দেখা যাচ্ছে, শেষ ঘনিয়ে আসছে খুব দ্রুত।

বিচিত্র নয়। জীবাণুর সহনশীলতা না থাকার ফলে আমেরিকার শ্বেতকায়দের সংস্পর্শে এসে পাষাণদেহী ইন্ডিয়ানরা হাম আক্রান্ত হয়ে দলে দলে নিকেশ হয়ে যায়নি? দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে দ্বীপে স্রেফ সর্দির জীবাণু কাতারে কাতারে জংলি দ্বীপবাসীকে পরলোকে পাঠায়নি?

হাডসনও লন্ডনের শীতের রাতে ঠান্ডা লাগিয়ে বসেছিল, বুকভরা শ্লেষ্মা নিয়ে নাকে মুখে সর্দি ঝরিয়ে উঠেছিল মঙ্গলগ্রহীদের খাঁচায়। অত্যন্ত পাজি এই সর্দির জীবাণু অদৃশ্য সেনানী হিসেবে কি আক্রমণ করেনি মঙ্গলগ্রহীদের?

কিন্তু ওয়াটসন এখন কোথায়? বেঁচে আছে তো? ওর জন্যে লেখা চিঠি এখনও ছুরি-গাঁথা অবস্থায় পড়ে আছে ম্যান্টলপিসে।

দূর থেকে অন্তিম কাতরানি, আবার শোনা গেল প্রাণী কণ্ঠের চিৎকার— যদি কণ্ঠ বলে কিছু থাকে অক্টোপাসের মতো বিকটদেহী আততায়ীদের।

বন্ধু, বহুদূর থেকে উড়ে এসেছিল পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন নিয়ে। সে স্বপ্ন এখন ধূলিসাৎ। হোমস এখন নিঃসন্দেহ। অদৃশ্য জীবাণুরা পাহারা দিচ্ছে পৃথিবীকে। মঙ্গলের আগন্তুকরা একে একে ঘায়েল হচ্ছে তাদেরই হাতে।

পায়ের চটিজুতো থেকে তামাক বার করে চেরী পাইপে ঠাসতে ঠাসতে হোমস ভাবল... আঃ, ওয়াটসন।

এই সময়ে... দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকল ওয়াটসন।
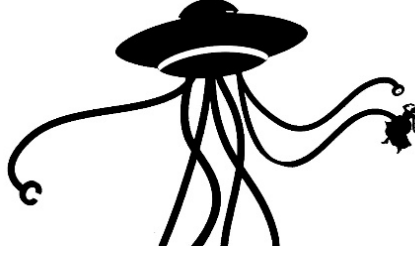
হাউ মাউ খাঁউ— মানুষের রক্ত পাঁউ

বাড়ি কাঁপিয়ে দরজা খুলে বন্ধ করলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। যেন পাগলা হাতি ঢুকল বাড়িতে।

আওয়াজ পেয়েই দৌড়ে হলঘরে নেমে এলেন চ্যালেঞ্জার-গৃহিণী।

'জর্জ, তুমি ঠিক আছ?'

'ঠিক আছি মানে? বোমার মতো ফেটে পড়লেন চ্যালেঞ্জার, 'রীতিমতো বেঁচে আছি। আর গবেট স্টেন্ট তার দলবল নিয়ে সাদা পতাকা দেখাতে গিয়ে ছাই হয়ে গেল নীল বিদ্যুতের ছোঁয়ায়। ইডিয়ট কোথাকার।'

শিউরে উঠে মুখে করতল চাপা দিয়ে জর্জ-গৃহিণী বললেন, 'কী বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি। নির্বোধগুলোকে সব বলেছিলাম। আমার কথা কানে তুলল না। তুললে এভাবে মরতে হত না। এক হতভাগা গর্তের ধারে দাঁড়িয়েও খুশি হয়নি— গর্তের ভেতরে নেমে কথা বলতে গিয়েছিল মঙ্গলের জীবদের সঙ্গে। পরিণামটা কী হল জানো?'

'কী?'

'কতকগুলো শুঁড় বেরিয়ে এসে হিড়হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে গেল ভেতরে। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েও আর লাভ হল না। ননসেন্স কোথাকার!'

'আহা রে! লোকটার কী হল, তার খোঁজ নিলে না, আর গাল পাড়ছ?'

'তবে না তো কি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হব? বারণ করেছিলাম, শোনেনি কেন?— কী রান্না হয়েছে? ক্ষিদে পেয়েছে— ঝটপট।'

খাবার এল তক্ষুনি। চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় দিয়ে উদরের অগ্নি নিভিয়ে গিন্নিকে সব কথা খুলে বললেন চ্যালেঞ্জার। বললেন, ক্রিস্টাল দিয়ে অনেক আগেই তিনি মঙ্গলের বাছাধনদের মতলবটা আঁচ করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রী-কে বলেননি পাছে ভয় পান। এখন আর

অত ভাবনা নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে— ভাবনা শুধু শার্লক হোমসকে নিয়ে। সে বেঁচে আছে তো? বৈজ্ঞানিকগুলো সাবাড় হয়েছে— তাতে দেশের অমঙ্গল খুব একটা হবে না। কিন্তু শার্লক হোমস ম'লে সারা পৃথিবীর ক্ষতি হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে এহেন কথাবার্তায় রাগ করে উঠে গেলেন প্রফেসর-গৃহিণী। ক্রিস্টাল নিয়ে বসলেন প্রফেসর। মাথায় কালো কাপড় চাপা দিতেই দেখলেন, কতকগুলো ধাতুর রডকে লিকপিকে শুঁড় দিয়ে জোড়া লাগাচ্ছে। মঙ্গলের বিকটদেহীরা। অর্থাৎ, নতুন অস্ত্র তৈরি হচ্ছে।

ফোন করলেন হোমসকে। সাড়া পেলেন না। তার পরের দিনও না। তার পরের দিন বিশেষ দূত মারফত একটা চিঠি এসে পৌঁছাল। হোমস জীবিত। কিন্তু লন্ডনে এখন নেই।

স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচলেন চ্যালেঞ্জার। হোমস আর তিনি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর মূল্যবান মস্তিষ্কের অধিকারী কেউ আছে বলে তিনি মনে করেন না।

তবে হোমসের দুটো কথা নিয়ে ফুঁসে উঠলেন প্রফেসর। হোমস লিখেছে, ওদের চোখে নাকি পৃথিবীর মানুষ কীট-পতঙ্গের সামিল। তাদের দলে প্রফেসর পড়তে রাজি নন। দ্বিতীয় কথাটা অবশ্য একটু চিন্তার ব্যাপার। পৃথিবীর জল হাওয়ায় মঙ্গলগ্রহীরা নাকি ফ্যাসাদে পড়তে পারে— স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে।

এ নিয়ে গবেষণার দরকার। কেন? গজগজ করতে লাগলেন প্রফেসর। তবুও খচখচ করতে লাগল মনের ভেতরটা। হাজার হোক হোমসের কথা তো। বাজে কথা সে বলে না।

হোমস আরও লিখেছে, ক্রিস্টালটা যেন সযত্নে রাখা হয়। এ ক্রিস্টাল দখল করার চেষ্টা করতে পারে ব্যাটাচ্ছেলেরা। ক্রিস্টালের কথা খেয়াল হতেই কালো কাপড় মাথায় ঢাকা দিয়ে বসে গেলেন প্রফেসর। দেখলেন চামড়ার থলির মতো দেহ নিয়ে মঙ্গলগ্রহীরা নড়াচড়া করছে। আরও দেখলেন ন্যাংটা শরীরে একটা মানুষকে চিৎপাত করে মাটির ওপর চেপে রয়েছে কতকগুলো ধাতু দিয়ে তৈরি শুঁড়। সেই লোকটা নিশ্চয়— ওকিং-এ গর্তে নেমেছিল বলে যাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল মঙ্গলগ্রহীরা। কিন্তু কী করতে চায় ওকে নিয়ে? কাপড়-জামা খুলে শুইয়ে রেখেছে কেন? ছটফট করছে লোকটা। হাঁ করে যেন খাবি খাচ্ছে। বোধহয় চেঁচাচ্ছেও। মঙ্গলগ্রহীরাও ঘিরে ধরেছে ওকে। ধাতুর শুঁড়গুলো চেপে রেখেছে মেঝের ওপর। হঠাৎ আর একটা ধাতুর শুঁড় আবির্ভূত হল দৃষ্টিপথে। একটা চকচকে নল ঢুকিয়ে দিল লোকটার বুকে। তারপর নলের খোলা নল মুখ লাগিয়ে একে

একে সরে যেতে লাগল ভিনগ্রহী আতঙ্কেরা। ঠিক যেভাবে সোডা ওয়াটার পান করা হয় কাগজের নল লাগিয়ে— অনেকটা সেই রকমের দৃশ্য দেখেই চ্যালেঞ্জার বুঝলেন কী ভয়ানক উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে আগন্তুকরা। মানুষের কাঁচা রক্ত ওদের উপাদের খাদ্য। টাটকা রক্তে সঞ্জীবিত রাখছে নিজেদের— উষ্ণ রুধিরে স্নিগ্ধ করছে তৃষিত দেহের জ্বালা। হোমস ঠিক অনুমানই করেছে। পৃথিবীর মানুষ ওদের কাছে পোকামাকড় ছাড়া কিছুই নয়।

ক্রিস্টাল নামিয়ে হাঁক পাড়লেন প্রফেসর। গিন্নিকে ডেকে বললেন, আজই লন্ডন ছেড়ে পালাতে হবে। এ জায়গা আর নিরাপদ নয়। ক্রিস্টাল সে কথা বলছে।

কী বলছে, তা আর ভাঙলেন না।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বনাম মঙ্গলগ্রহী

সেই রাতেই চম্পট দেবেন মুখে বললেও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লন্ডন ছেড়ে নড়লেন না প্রফেসর। রোজ নিজে গিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হকারের কাছ থেকে খবরের কাগজ কিনে পড়তেন, সারে জেলা থেকে— মঙ্গলগ্রহীদের মার খেয়ে ভিটেছাড়া হয়ে পালিয়ে আসা মানুষদের জেরা করতেন, কী কী হাতিয়ার আততায়ীরা ব্যবহার করছে, তার হিসেব নিতেন এবং আগন্তুকদের উদ্দেশ্যটা আঁচ করবার চেষ্টা করতেন। আর রোজ রাতে লক্ষ করতেন আকাশ থেকে তারা খসে পড়ার মতো একটি করে চোঙা এসে নামছে পৃথিবীতে। আর প্রতিদিন বার কয়েক টেলিফোন করতেন শার্লক হোমসকে। রিং বেজেই যেত, কেউ ধরত না। রেগেমেগে দড়াম করে রিসিভার ঝুলিয়ে রেখে ফের দাঁড়াতেন রাস্তায়।

এইভাবেই একদিন রাস্তায় শুনলেন ড্রাইভার অস্টিনকে একটা লোক কী যেন বোঝাচ্ছে। অস্টিন রাজি হচ্ছে না।

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন চ্যালেঞ্জার, লোকটার সঙ্গে একটা এক ঘোড়ার চমৎকার গাড়ি। দুজনের বসার জায়গা আছে।

দেখেই মতলবটা এল মাথায়।

'অস্টিন!' হাঁক দিলেন প্রফেসর। দৌড়ে এল অস্টিন।

'কী বলেছে লোকটা?'

'আজ্ঞে, ভলান্টিয়ার হতে বলছে।'

'কীসের ভলান্টিয়ার?'

'ট্রেন চালাতে হবে। ড্রাইভার পাওয়া যাচ্ছে না।'

'চ্যালেঞ্জার জানতেন গুণধর অস্টিন অনেক কিছুই ড্রাইভ করতে জানে। তাই কথা না বাড়িয়ে বললেন, 'যাও।'

‘যাব?’ অস্টিন যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

‘হ্যাঁ, যাও দেশের কাজ করো। এ বাড়ির কাজের লোকদের দেশে পাঠিয়ে দাও। আর ওই লোকটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।’

অস্টিম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ডেকে নিয়ে এল গাড়ি আর ঘোড়ার মালিক অচেনা মানুষকে।

‘আপনার ড্রাইভার অস্টিনকে—’

‘আপনাদের দরকার? নিয়ে যান। বিনিময়ে আপনার ওই গাড়ি আর ঘোড়াটা রেখে যান। কত দাম?’

‘অ্যাঁ?’

‘কত দাম?’

‘আজ্ঞে... মানে...’

‘এই নিন দশ পাউন্ড। গাড়ি আর ঘোড়া আমার। আচ্ছা আসুন।’

হতবাক লোকটাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেই চ্যালেঞ্জার ছুটলেন বাড়ির ভেতরে, ‘জেসি! জেসি!’

হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন প্রফেসর-জায়া। ছাদ কাঁপানো অমন ডাক শুনলে কেউ স্থির থাকতে পারে?

‘জেসি, জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। গয়না সব নেবে, কিছু খাবার আর জল। জলদি!’

‘কোথায় যাব?’

‘বাঁচতে,’ বলে আর কথা বাড়ালেন না প্রফেসর। ঝটপট নিজে বাইরের পোশাক পরে নিয়ে পকেটে গুঁজে নিলেন বেশ কিছু নোট আর মোহর। তারপর মালপত্র আর গিন্নিকে আগে তুলে দিলেন গাড়িতে। নিজে উঠে বসলেন গিন্নির পাশে। গাড়ি ছোটালেন পরমুহূর্তেই।

দিন কয়েকের বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে পাতা ভরাতে আর চাই না। কোথাও পরিত্যক্ত দোকান থেকে খাবার সংগ্রহ করলেন, কোথাও বা তালা দেওয়া দরজা ভেঙে পরের বাড়িতে রাত কাটালেন, আবার কখনও স্রেফ খড়ের গাদাতেই কর্তাগিন্নি রাত কাটিয়ে দিলেন। এইভাবে পঞ্চাশটা মাইল পেরিয়ে পৌঁছোলেন সমুদ্রতীরে।

গিয়ে দেখলেন, বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে তাঁদের আগেই। খানকয়েক ছোটবড়ো জলপোতে বিপজ্জনকভাবে উঠছে যাত্রী। দূরে দাঁড়িয়ে একটা যুদ্ধজাহাজ, প্রহরারত।

মুশকিলে পড়লেন চ্যালেঞ্জার। যে রকম গুঁতোগুঁতি চলছে, বউ নিয়ে ওঠা মুশকিল। পকেটে টাকা আছে, কিন্তু টাকা ছড়িয়েও কাজ তো হবে না। জায়গা তো নেই।

হঠাৎ একটা চিৎকার শোনা গেল, 'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।'

ফিরে দাঁড়ালেন প্রফেসর। খর্বকায় এক ক্যাপ্টেন উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে তাঁর পানে। কাছে এসেই বললে সোল্লাসে, 'চিনতে পারছেন? আমি হ্যারিস। ক্যাপ্টেন হ্যারিস!'

তীক্ষ্ণ চোখে হ্যারিসের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রফেসর বললেন, 'বিলক্ষণ চিনেছি। এক বছর তিন মাস দু-দিন আগে—'

'আপনি আমার বিরাট একটা উপকার করেছিলেন, সেদিন যদি—'

'থাক সেকথা। নিজের জাহাজটা কোথায়?'

'ওই তো!' দূরে ভাসমান একটা সাদা স্টিমারের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে বললে খর্বকায় ক্যাপ্টেন, 'দেখছেন-না স্টিম তুলছে। এখুনি রওনা হব। আপনি যাবেন? একটা জায়গা এখনও আছে— কতজনে এসে ঝুলোঝুলি করেছে। একজনের বেশি কাউকে তুলব না। ইনি আপনার সঙ্গে আছেন বুঝি? ইনিও যাবেন— জায়গা হয়ে যাবে। চলুন।'

তড়বড়ে হ্যারিস স্তব্ধ হতেই প্রফেসর বললেন, 'দক্ষিণা?'

'আপনার কাছে দক্ষিণা?'

বিশ পাউন্ড বার করে হ্যারিসের হাতে গুঁজে দিয়ে প্রফেসর বললেন কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে, 'ইনি আমার স্ত্রী। নিতান্ত অবলা। এঁকে নিরাপদে প্যারিসে পৌঁছে দেওয়ার ভার তোমার। সেখানে আমার বন্ধু প্রফেসর পঁসির কাছে গেলেই উনি যা করবার করবেন।— জেসি, যাও ক্যাপ্টেন হ্যারিসের সঙ্গে।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জেসি বললে, 'জর্জ, তুমি?'

'আমার কাজ এখানে— প্যারিসে নয়। তোমাকে নিরাপদ জায়গায় না পাঠানো পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলাম না। যাও।'

দ্বিরুক্তি করার সাহস হল না জেসির। কোনওদিনই হয়নি। দুর্দান্ত স্বামীর প্রতিটি সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে বিনা প্রতিবাদে— তাতে মঙ্গলই হয়েছে, প্রফেসর কখনও ভুল করেন না— জেসি তা জানেন।

চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে উঠলেন চিমনিতে ধোঁয়াওঠা স্টিমারে। সঙ্গে সঙ্গে স্টিমার ছেড়ে গেল জেটি থেকে। অনেকক্ষণ নিষ্পলকে সেদিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। একটু একটু করে দিগন্তে মিলিয়ে গেল সাদা স্টিমার। ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর। দেখলেন, ঘোড়া এবং গাড়ি উধাও। সেই সঙ্গে বাকি মালপত্র!

চোর বদমাসের কাজ নিশ্চয়ই। আসবার পথেও তিনজন গুন্ডার হাতে পড়েছিলেন। দুজনকে লাথি মেরে শুইয়ে দিয়েছিলেন। তৃতীয়জন ছুরি নিয়ে তেড়ে আসতেই কবজি ধরে হাত খুলে দিয়ে ছুরি কেড়ে নিয়েছিলেন। তা-ই বুঝি তার তন্ময়তার সুযোগ নিয়ে নিঃশব্দে চুরি হয়ে গেল একমাত্র যান এবং বাহন— এই হট্টগোলের সময়ে যা অমূল্য।

রাগে হাত মুঠো পাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করলেন প্রফেসর। ঘন ঝোপের মতো ভুরুর তলায় যেন স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এল নীল চোখ থেকে। কিন্তু খামোকা রাগ করলে তো চলবে না — পঞ্চাশ মাইল পথ পেরিয়ে ফিরে যেতে হবে লন্ডনে।

তার আগে রাতটা সমুদ্রতীরেই কাটানো দরকার। এদিক-ওদিক চাইলেন প্রফেসর। কিছুদূরে একটা টিলা। টিলার ওপর একটা প্রস্তর নিবাস। স্বাস্থ্যনিবাস নিশ্চয়। এখন দরজা জানলা বন্ধ।

টিলায় উঠতে আরম্ভ করলেন প্রফেসর। সূর্য ক্রমশ চলছে পশ্চিমে। প্রস্তর নিবাসে যখন পৌঁছলেন, তখন সূর্য দিগন্ত প্রায় ছুঁয়েছে। নীচের ভিড়ও অনেক বেড়েছে। বেড়েছে চিৎকার চেঁচামেচি। জাহাজ কম, কিন্তু যাত্রী বেশি। কাতারে কাতারে আরও লোক আসছে। যতদূর দু-চোখ যায়, মানুষ ছাড়া কিছু নেই।

অমানুষদের দেখা গেল ঠিক তখনই।

আচমকা আতঙ্কে যেন ফেটে পড়ল পলাতক মানুষগুলো। পড়ি কি মরি করে দৌড়াতে লাগল সমুদ্রের তীর লক্ষ করে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উলটো দিক থেকে ভেসে এল ঝনাৎকার। ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ ঝনাৎ... ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ ঝনাৎ!

আসছে মেটাল মনস্টার! ধাতব দানব!

অচিরেই বড় বড় গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে দেখা গেল প্রায় একশো ফুট লম্বা অতিকায় অমানুষিকীকে। তিনটে সন্ধিযুক্ত ধাতুর ঠ্যাংয়ের ওপর অদ্ভুতভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে

প্রায় এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিবেগে দৌড়ে আসছে মঙ্গলের অমঙ্গল। পিঠে বিরাট খাঁচায় ছটফট করছে নরদেহ! জীবন্ত খাদ্য।

পরমুহূর্তেই হাহাকার শোনা গেল বাঁ দিক থেকে। চোখ ফিরোলেন প্রফেসর। সেদিকেও আবির্ভূত হয়েছে একটা মনস্টার— দৈত্য!

আবার বুক চাপড়ানির মতো করুণ কান্নাকাটিতে আকাশ যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল পেছন দিকে। আবার ফিরলেন প্রফেসর। সেদিকেও লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে পর্বতপ্রমাণ চলন্ত টুলের মতো এগিয়ে আসছে একটা দানব। তিনটে ঠ্যাংয়ের ওপর একটা ত্রিভুজের মতো ফ্রেমের মধ্যে খাড়া বয়লার সদৃশ ডিম্বাকার আধার— মঙ্গলের প্রাণীর ককপিট। অনেকগুলো ধাতুর শুঁড় কিলবিল করছে চারদিক থেকে। দুটো শুঁড় একটা বাক্সর মতো যন্ত্র ধরে রেখেছে সামনের দিকে।

'নীল বিদ্যুতের যন্ত্র!' আপন মনেই বললেন প্রফেসর।

সমুদ্রতীরে তখন মড়াকান্না উঠেছে। আতঙ্কিত ধাবমানদের পদতলে যে কতজন পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কেউ তা ফিরেও দেখছে না। সবাই ছুটছে জলের দিকে। কিন্তু কীসের ভরসায়? জলযানগুলো বেগতিক দেখে নোঙর তুলে সরে যেতে শুরু করেছে বারদরিয়ার দিকে।

লক্ষ বৃংহিত ধ্বনিকে হার মানিয়ে দেওয়ার মতো স্টিম সাইরেন বাজিয়ে তিন দানব সটান ধেয়ে গেল জলের দিকেই। পলায়মান জলযানদের পথরোধ করাই যেন উদ্দেশ্য। কিন্তু জলের ধারে পৌঁছেই বিড়ম্বনায় পড়েছে মনে হল। মঙ্গলে এরকম সমুদ্র নেই। জলাতঙ্ক থাকা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও দানব তিনটে বুক জলে নেমে গেল হুড়মুড় করে।

আর ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল ফুল স্পিডে তিন দানবের দিকে ধেয়ে আসছে দূরের যুদ্ধ জাহাজটা। আসছে শরীরী আতঙ্কের মতো। উদ্দেশ্য অতিশয় স্পষ্ট। নিরীহ জলযানদের রক্ষে করতেই হবে মঙ্গলের আতঙ্কদের খপ্পর থেকে।

তাই গোধূলির রক্তাভায় দূর থেকেই দেখা গেল আগুনের ঝলক। পরক্ষণেই নির্ভুল লক্ষ্যে একটা বয়লার চুরমার হয়ে গেল গোলার ঘায়ে। হেলে পড়ল তিনটে ঠ্যাং। আবার শোনা গেল কামান নির্ঘোষ। আবার গোলা ধেয়ে এল দ্বিতীয় দানবটার দিকে— এবারও নির্ভুল লক্ষ্যে চূর্ণ হয়ে গেল দ্বিতীয় বয়লার। তাল তাল বাষ্প ঠেলে উঠল ভেতর থেকে— সেই সঙ্গে সবুজ ধোঁয়া।

তৃতীয় দানবটা ততক্ষণে রণনীতি ধরে ফেলেছে। জাহাজ লক্ষ করে নীল বিদ্যুৎও নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ার ফলে হতচকিত হওয়ার দরুনই বোধহয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। যুদ্ধ জাহাজের পাশ দিয়ে নীল বিদ্যুৎ গিয়ে জল স্পর্শ করতেই ছ্যাঁক করে একতাল বাষ্প ঠিকরে গেল শূন্যে।

তিনঠেঙে দানব কিন্তু আর দাঁড়াল না। পড়ি কি মরি করে জল থেকে উঠেই চম্পট দিল জঙ্গলের দিকে। মৃদু হাসি ফুটে উঠল চ্যালেঞ্জারের মুখে। পালটা মার তাহলে দিতে পেরেছে পৃথিবীর মানুষ। তাড়িয়ে দিতে পেরেছে অজেয় মঙ্গল-বিভীষিকাকে।

হাসি মিলিয়ে গেল পর মুহূর্তেই। আকাশ তখন কালো হয়ে আসছে। ভোঁ বেজে উঠেছে যুদ্ধজাহাজে। বিজয়োল্লাসের অট্টরোল শোনা যাচ্ছে সমুদ্রতীরে।

আর ঠিক তখনই জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে কিন্তু অকল্পনীয় দ্রুতবেগে ছিটকে এল একটা উড়ুক্কু যন্ত্রযান। সোজা ধেয়ে গেল সমুদ্রের ওপর দিয়ে যুদ্ধজাহাজের দিকে। চক্ষের পলক ফেলবার আগেই সাদা মতো একটা বস্তু রকেটের মতো উড়ন্ত পিরিচ থেকে ছুটে গেল যুদ্ধজাহাজ লক্ষ করে এবং জাহাজ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হল চাপা শব্দে।

পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেল পুরো জাহাজ এবং আশপাশের জল। এক চক্কর ঘুরে এসে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই নীল বিদ্যুৎ নিক্ষেপ করল উড়ন্ত চাকতি এবং কান ফাটানো শব্দে জাহাজটা ফেটে ছিটকে গেল শূন্যে এবং দিকে দিকে।

হাঁ হয়ে এই দৃশ্য দেখল সাগরের পাড়ে দাঁড়ানো হতবাক মানুষেরা— দেখল ভাসমান জলযানের যাত্রীরা। উড়ন্ত চাকতি কিন্তু তখন প্রতিহিংসায় নির্মম হয়ে উঠেছে। মুহুর্মুহু নীল বিদ্যুৎ ছুটে এল এক-একটা জলযান লক্ষ করে। নিমেষে নিমেষে অগ্নিদেবতা নৃত্য করে উঠল এক-একটা জলযানের ওপর। এ কী নিষ্ঠুরতা! কী উন্মত্ততা!

কিন্তু জিঘাংসার তখনও বাকি। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের বিস্ফারিত চোখের সামনেই ঘটল সেই কাণ্ড। সব ক-টা জলযানে আগুন ধরিয়ে দিয়ে উড়ন্ত চাকতি সটান ছুটে এল সমুদ্রতীরে এবং বেশ খানিকটা নেমে এসে আতঙ্কে আধমরা মানুষগুলোর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল উল্কার মতো প্রচণ্ড বেগে।

সেই সঙ্গে পেছন থেকে বেরিয়ে এল তাল তাল কালো ধোঁয়া। যেন প্রকাণ্ড পিচকিরি দিয়ে কালো ধোঁয়াকে পাম্প করে ছড়িয়ে দেওয়া হল অসহায় মানুষগুলোর ওপর।

ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়েই সাঁ করে ওপরে উঠে গিয়ে, যেদিক থেকে এসেছিল, সেই দিকেই মিলিয়ে গেল উড়ন্ত চাকতি। ফিরেও দেখল না ধ্বংসলীলা কী পর্যায়ে পৌঁছেছে।

দেখলেন কেবল প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। ধোঁয়া সরে যাওয়ার পর দেখলেন, কাতারে কাতারে মানুষ লুটিয়ে পড়েছে বালির ওপর। নিষ্প্রাণ। নিষ্পন্দ।

তরল গ্যাসের মতোই ভারী ধোঁয়া গড়িয়ে যাচ্ছে বালির ওপর দিয়ে— ওপরে উঠছে না পৃথিবীর সব ধোঁয়ার মতো।

তাই টিলার ওপর ছিলেন বলে প্রাণে বেঁচে গেলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

অগণিত মড়ার দিকে তাকিয়ে রাত কাটিয়ে দিল প্রফেসর। ঘুমোলেন ভোরের দিকে। তারপর পায়ে পায়ে রওনা হলেন লন্ডনের দিকে। পথের কষ্টকে কষ্ট মনে করলেন না। খাবার ফুরিয়ে গেলে দোকান ভেঙে লুঠ করতে দ্বিধা করলেন না। রাতেই হাঁটলেন বেশি— লুকিয়ে রইলেন ঝোপেঝাড়ে। এইভাবে পৌঁছোলেন লন্ডনের উপকণ্ঠে। লন্ডনের দিকে তখন কেউ যাচ্ছে না। লন্ডন নাকি পুরোপুরি মঙ্গলগ্রহীদের পাল্লায়। চ্যালেঞ্জার এক কান দিয়ে শুনলেন— আর এক কান দিয়ে বার করে দিলেন। রাত গভীর হতেই অন্ধকারে গা ঢেকে ঢুকলেন শহরে। এপথ-সেপথ পরিক্রমা করার সময়ে চাঁদের আলোয় নালার মধ্যে অদ্ভুত রকমের লাল ফুল দেখে অবাক হলেন। মঙ্গলগ্রহীরা এর মধ্যেই বাগান সাজাতে আরম্ভ করে দিয়েছে দেখে এত কষ্টেও একটু হাসলেন। তারপর এক সময়ে এনমোর পার্কে নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছোলেন। বাড়ি অটুট। দরজা বন্ধ। পকেট থেকে চাবি বার করে দরজায় যেই লাগিয়েছেন, অমনি চাঁদের আলোয় ছায়া পড়ল দরজার ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর। অদূরে দাঁড়িয়ে একটা ধাতবদানব।

চক্ষের পলকে দরজা খুলেই ভেতরে ঢুকে গেলেন প্রফেসর। যেতে যেতেই শুনলেন ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে এই দিকে। এক্সপ্রেস ট্রেনের স্পিডে ছুটে এসে তিনটে ঠ্যাং ভেঙে বয়লার দেহটা প্রায় দরজার সামনে নিয়ে এল দানবটা— সেই সঙ্গে ধাতুর শুঁড়ের ঝাপটায় কাচের শার্সি ভেঙে শুঁড় গলিয়ে দিল ভেতরে।

কিন্তু গরিলার মতো বপু নিয়েও প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যে হরিণের মতো ক্ষিপ্র হতে পারেন, সে প্রমাণ তিনি দিলেন সেদিন। ধাতুর শুঁড়ের অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতাকে হার মানিয়ে তিনি সাঁৎ করে হলঘরের পেছনের দরজা দিয়ে পৌঁছোলেন পেছনের উঠোনে— সেখান থেকে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে পাশের গলিতে। কোণ থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেন দানবটা

শুঁড় বাড়িয়ে তখনও ভেতর হাতড়াচ্ছে— চুরমার করছে জিনিসপত্র। কাজেই বাড়িটাকে এই উৎপাতের হাত থেকে রক্ষে করার জন্যে তিনি একটা দুষ্টবুদ্ধির শরণ নিলেন। রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে মেটাল মনস্টারকে লক্ষ করে ছুড়ে মারলেন। ঠন করে বয়লার বপুতে লেগে ঢিলটা ঠিকরে যেতেই সপাৎ করে একটা শুঁড় আছড়ে পড়ল তাঁর দিকে— সেই সঙ্গে ঘুরে গেল বয়লার দেহ। গরিলা দেহটা দেখিয়েই প্রফেসর চ্যালেঞ্জার স্রেফ লুকোচুরি খেলে গেলেন ভিনগ্রহের নিষ্ঠুর আততায়ীর সঙ্গে— ছেলেবেলায় খেলেছিলেন, দেখলেন এখনও দিব্বি মনে আছে। দুটো বাড়ির মাঝের গলি দিয়ে বাঁইবাঁই করে দৌড়ে শেষ প্রান্তে পৌঁছে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলেন ছেড়ে আসা প্রান্তে কালান্তক যমদূতের এই ঝন্ ঝনাৎ ঝন্ ঝনাৎ শব্দে আবির্ভূত হয়েছে চলমান যন্ত্রবাহন। বোঁ করে পাশের বাড়ি ঘুরে পাশের গলি দিয়ে ফের রাস্তায় এসে কামানের গোলার মতোই নিজের বাড়ির সামনে এসে গেলেন বুড়ো খোকা চ্যালেঞ্জার এবং পরক্ষণেই উধাও হলেন বাড়ির মধ্যে। পুরো ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে পাছু-নেওয়া দত্যিটা ঝন্ ঝনাৎ ঝন্ ঝনাৎ শব্দে পাশের বাড়ি চক্কর দিয়ে এসে দেখল দাড়িওলা পৃথিবীর পোকা মানুষটা আর নেই— বেমালুম নিপাত্তা। নিশ্চয় রাস্তা দিয়ে পালিয়েছে— এই মনে করে বায়ু বেগে ছুটে গেল রাস্তার এমোড় থেকে ওমোড়ে, ওমোড় থেকে এমোড়ে। কিন্তু ভোঁ-ভাঁ। দাড়িওলা বিটলে পোকাটার আর টিকি দেখা গেল না। রাম ভীতু কোথাকার! স্টিম সাইরেনের তীব্র শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে আকাশছোঁওয়া অট্টহেসেই বোধহয় গজেন্দ্রগমনে উধাও হল সে পাশের রাস্তায়। প্রফেসরও জানলার ফাঁক দিয়ে সেই দৃশ্য দেখেই একচোট হেসে সটান গেলেন রান্নাঘরে অনেকদিন পরে ভালোমন্দ কিছু খাওয়ার অভিলাষ নিয়ে।

খেয়েদেয়ে সুস্থ হয়ে স্নান করতে ঢুকলেন। কলে তখনও জল ছিল। সাবান মেখে স্নান করে এসে বসলেন পড়ার ঘরে। দেওয়ালের একটা ছবি সরিয়ে ভেতরকার খুপরি থেকে বার করলেন ক্রিস্টালটা। স্ত্রী-কে নিয়ে অ্যাডভেঞ্চারে বেরোনোর সময়ে ইচ্ছে করেই অমূল্য এই বস্তুটি তিনি সঙ্গে নেননি।

এখন সেই অমূল্য নিধিই বার করে ফের বসলেন টেবিলে। মাথায় কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে দৃকপাত করতেই দেখতে পেলেন বিস্তর চকচকে রড আর মেশিন নিয়ে অনেকগুলো বিকটদেহী মঙ্গলগ্রহী জোড়াতালা লাগাচ্ছে বিরাট বড় একটা গর্তের মধ্যে— ওকিং-এ যে-গর্ত দেখেছিলেন তার দশগুণ বড় তো বটেই। হতচ্ছাড়ারা নতুন নতুন মেশিন বানাচ্ছে।

দশটা সিলিন্ডার তো এসেই গেছে। পঞ্চাশ থেকে ষাটটা বিকটাবতারও এসেছে পৃথিবী জয়ের স্বপ্নে মশগুল হয়ে। অফুরন্ত খাদ্য যে এখানে। ভাবতে না ভাবতেই ক্রিস্টালের বুকে ফুটে উঠল সেই ভয়ানক দৃশ্য। সম্পূর্ণ নগ্ন একটা লোককে টেনে এনে ফেলা হল যন্ত্রপাতির গাদার মধ্যে। কতকগুলো শুঁড় চেপে ধরল তাকে মেঝের ওপর। আর একটা শুঁড় একটা নল তুলে ধরল বুকের কাছে...

কাপড় চাপা দিয়ে ক্রিস্টালকে দেওয়ালের খুপরিতে চালান করলেন প্রফেসর। এ দৃশ্য দেখা যায় না। অসহ্য! অসহ্য! অসহ্য! এই কারণেই ভেড়ার পালের মতো মানুষগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সমুদ্রের তীরে। এই কারণেই পিঠের খাঁচায় মুরগি বওয়ার মতো নিয়ে যাওয়া হয় মানুষদের— খিদে পেলেই টাটকা রক্তপানের উদ্দেশে।

সারা শরীর বিবমিষায় শিউরে ওঠে প্রফেসরের। জ্ঞানে বিজ্ঞানে শৌর্যে বীর্যে সমুন্নত মানুষের এই শিক্ষাটুকুর দরকার ছিল বোধহয়— দর্পচূর্ণ হচ্ছে কিন্তু বড় শোচনীয়ভাবে।

গুম হয়ে বসে রইলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

রাত ভোর হতেই ছাদে গিয়ে দেখলেন চারপাশ। পরিষ্কার আকাশ। বাতাসে ধোঁয়া নেই। স্টিম সাইরেনের সংকেত শোনা গেল দিকে দিকে। লন্ডন করায়ত্ত— এ বুঝি তারই বিজয়োল্লাস।

নেমে এলেন প্রফেসর। শুকনো মাংস আর রুটি দিয়ে ব্রেকফাস্ট খেলেন। জল গরম করে চা করলেন। তারপর বেরোলেন রাস্তায় টহল দিতে। শত্রুর নজর বাঁচিয়ে পথ পরিক্রমা চালিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু চ্যালেঞ্জার যে এ বিদ্যাতেও পটু, তার প্রমাণ দিলেন রাস্তায় বেরিয়ে। হানা দিলেন বেকার স্ট্রিটে— শার্লক হোমসের দেখা পেলেন না। ফিরে এলেন গজগজ করতে করতে। তৃতীয় দিন রাত্রে সহসা রাস্তাঘাট ঝলমল করে উঠল বিদ্যুৎ বাতিতে। এ কী কাণ্ড! এ তো নীল আলো নয়, সবুজ আলোও নয়। এ যে ঝকঝকে সাদা আলো! তবে কি মঙ্গলগ্রহীরা বিদায় নিয়েছে? লন্ডন বিভীষিকা মুক্ত হয়েছে? বিমূঢ় হয়ে পথে বেরিয়ে এলেন চ্যালেঞ্জার। দেখলেন, তিনি একা নন, ভোজবাজির মতো বহু লন্ডনবাসীও বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। আনন্দে তারা হাত ধরাধরি করে নাচছে, গাইছে, হাসছে।

সহসা হাসি রূপান্তরিত হল কান্নায়। পতঙ্গকে আলো দেখিয়েই টেনে আনতে হয়। ভিনগ্রহীরাও তা-ই করেছে। গর্ত থেকে পোকার মতোই মানুষদের টেনে নামিয়েছে রাস্তায়।

পরমুহূর্তেই দলে দলে তারা হানা দিল রাস্তায় রাস্তায়। চ্যালেঞ্জারের চোখের সামনেই একটা ত্রিপদ দৈত্য শুঁড় বুলিয়ে এক একবারে তিন-চারজনকে ধরে পুরতে লাগল খাঁচায়। শ-খানেক মানুষ তোলা হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে!

পালিয়ে এলেন প্রফেসর! সত্যিই পালিয়ে এলেন।

ওয়াটসনের অভিজ্ঞতা

ওয়াটসন ছিল লন্ডন শহরেই— হাইগেট অঞ্চলে। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে ওর যে বিশ্বস্ত আর্দালি মুরে ওর জীবন বাঁচায়, তার অন্তিম শয্যায় হাজির ছিল প্রথম সিলিন্ডার সারে জেলায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে থেকেই। মুরে তখন অচেতন। দিনরাত সেবা করে গিয়েছে ওয়াটসন। শুক্রবার প্রথম চোঙা নামল ওকিং-এ। তারপরের সাতটা দিনে অনেক কাণ্ডই ঘটে গেল সারে জেলা আর লন্ডন শহরে। প্রতি রাতে নামল একটা চোঙা। প্রতিদিন আসতে লাগল নতুন নতুন খবর। প্রতিটিই আগের চাইতে উৎকণ্ঠাময়, ভয়ংকর এবং রোমাঞ্চকর। তারপর শুরু হল লন্ডন ত্যাগের হিড়িক। হাইগেট পর্যন্ত ফাঁকা হয়ে গেল সাতদিনের মধ্যে। অথচ একদিনের জন্যেও মাত্র পাঁচ মাইল দূরে বেকার স্ট্রিটে গিয়ে বন্ধুবর শার্লক হোমসের খবরটা পর্যন্ত নেওয়ার সময় হল না ওয়াটসনের।

হল মুরের মৃত্যুর পর। চাদর দিয়ে মৃতদেহ ঢেকে গিয়ে উঁকি মারল বাইরে। এই ক-দিন রাস্তায় এক্সপ্রেস ট্রেনের বেগে চলমান ধাতব দানবদের সে ছুটতে দেখেছে। ধাতুর জয়েন্ট থেকে ফুস ফুস করে সবুজ বাষ্প বেরিয়ে আসতে দেখেছে ছোটার সময়ে। ছাদের মাথা দিয়ে একশো ফুট লম্বা বয়লারের মাথাও দেখেছে। দেখেছে এপাশে-ওপাশে বহু বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে মেটাল মনস্টারদের আক্রমণে। দেখেছে নীল বিদ্যুতের ছোঁয়ায় বাড়ির পর বাড়ি কীভাবে নিমেষে জ্বলে উঠছে। দেখেছে রাস্তা থেকে পলায়মান মানুষগুলোকে কীভাবে শুঁড় ঝুলিয়ে টপাটপ তুলে নিয়ে পিঠের খাঁচায় বন্দি করে রাখছে আকাশছোঁয়া দৈত্যরা। ভাগ্যক্রমে অক্ষত থেকে গিয়েছে ও যেখানে ছিল, সেই বাড়িটি। তাই ওপরতলায় জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছে কীভাবে ফাইটিং মেশিনরা কালো ধোঁয়া ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ মেরেছে, সৈন্য মেরেছে, মারমুখো জনতাকে মেরেছে। তারপর দেখেছে সেই ধোঁয়াই থিতিয়ে গিয়ে কালো গুঁড়ো হয়ে রাস্তা ছেয়ে

গিয়েছে— তার ওপর রাস্তার কুকুরকে হাঁটতে দেখেছে। কুকুর কিন্তু মরেনি। এ থেকেই বুঝেছে, কালো ধোঁয়া শুকিয়ে গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়লে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়।

মুরে যখন মারা গেল অজ্ঞান অবস্থাতেই, তখন লন্ডন নিস্তব্ধ। পথঘাট খাঁ-খাঁ করছে। ওষুধের ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিল ওয়াটসন। হেঁটেছে রাতের অন্ধকারে— ঘুমিয়েছে পরিত্যক্ত বাড়ির মধ্যে দিনের বেলা। পাঁচ মাইল পথ পেরুতেই প্রাণান্ত হয়েছে। প্রিমরোজ হিলের ওপর আধডজন ফাইটিং মেশিনকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝেছে ওইখানেই তাদের আসল ঘাঁটি। ওই জন্যে একটা সবুজ আলোয় আলোকিত হয়ে থাকে জায়গাটা। নালায় দেখেছে অদ্ভুত লাল ফুল। মাটিতে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে সেই ফুল। রেল লাইনের বাঁধ পর্যন্ত ছেয়ে গেছে বিচিত্র ফুলে। রিজেন্ট স্ট্রিটে দেখেছে ঝকঝকে সাদা আলো। ছুটে গিয়েছিল ওয়াটসন নিজেও। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। দূর থেকেই দেখেছে টপাটপ মানুষ তুলে খাঁচায় পোরার দৃশ্য। ফাইটিং মেশিনদের ধারেকাছেও আর ঘেঁসেনি ওয়াটসন— আলো দেখে আর ভোলেনি। পরের দিন ধুঁকতে ধুঁকতে বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে বন্ধুবরের কামরায় ঢুকে দেখেছে শার্লক হোমস প্রশান্ত চিত্তে চেরিকাঠের পাইপ ঠাসছে পারস্যদেশের চটিজুতোয় রাখা তামাক দিয়ে।

ওয়াটসনকে দেখেই বলেছে সহজভাবে, 'এসো ওয়াটসন। তোমাকেই খুঁজছিলাম।' যেন হাতে একটা জটিল কেস এসেছে— আলোচনা দরকার।

আর সইতে পারেনি ওয়াটসন। মাথা ঘুরে পড়ে গেছে একটা চেয়ারে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ব্র্যান্ডি এনে বন্ধুর গলায় ঢেলে দিয়েছে হোমস। সংবিৎ ফিরে পেয়ে ওয়াটসন জিজ্ঞেস করেছে, 'অ্যাদ্দিন এখানেই ছিলে নাকি?'

'মোটেই না। রোববার বেরিয়েছিলাম মিসেস হাডসনকে নিয়ে। গাঁয়ে রেখে এলাম— নিজের লোকজন আছে সেখানে। ফিরেছি বুধবার। অপেক্ষায় ছিলাম তোমার আর প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের।'

'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার!'

'হ্যাঁ। বিরাট বৈজ্ঞানিক। নিজেকে আরও বিরাট মনে করেন।'

'হামবড়া?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর অপেক্ষায় কেন?'

‘ক্রিস্টালটা তাঁর কাছেই গচ্ছিত রেখেছি যে।’

‘কোন ক্রিস্টালটা?’

হোমস তখন খুলে বলল। এতদিন যা বলেনি ওয়াটসনকে একবাড়িতে থেকেও— সব বলল। বলল, কীভাবে চ্যালেঞ্জার আর তিনি আগে থেকে জানতেন মঙ্গলগ্রহ থেকে আক্রমণ শুরু হবে পৃথিবীতে। ওকিং-এ প্রথম চোঙাটা পড়তেই চ্যালেঞ্জার দৌড়ে গেছিলেন সেখানে। কিন্তু তাঁর কথা না শুনে স্টেন্ট আর ওগিলভি প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা মরেছে। হয়তো চ্যালেঞ্জারও। কেননা সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনি নিপাত্তা।

ঠিক এই সময়ে সদর দরজা থেকে বাড়ি কাঁপানো ষণ্ডকণ্ঠে একটা হাঁক ভেসে এল, ‘মহাশয়ের অন্দরে কি প্রবেশ করতে পারি?’

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে চেনে মঙ্গলগ্রহীরা

ধনুক থেকে যেভাবে শনশন করে তির ছুটে যায়, সেইভাবেই শার্লক হোমস চক্ষের নিমেষে ছিটকে গেল চেয়ার থেকে। দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে হইহই করে যাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এল ওপরের ঘরে, তাঁকে দেখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ওয়াটসন। এ যে মানুষ-গরিলা। যেমন চওড়া কাঁধ, তেমনি লোমশ ভুরু। বুকের পাটা তো প্রকৃতই দরজার কপাটের মতো। ইয়া দাড়ি— আসীরিও নৃপতিদের মতো। ঘন নীল চোখ। হাতে ঝুলছে একটা টিনের বাক্স। এ আবার কে?

নীরব জিজ্ঞাসার জবাব দিল হোমস, 'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, যার কথা তোমাকে বলছিলাম, ওয়াটসন।'

'ওয়াটসন?' বিরাট ভুরু কুঁচকে প্রফেসর বললেন, 'এই সেই ওয়াটসন? ডাক্তার? তোমার সহযোগী?'

'হ্যাঁ। এইমাত্র আপনার কথাই বলছিলাম। ভাবছিলাম হয়তো আর ইহলোকে নেই আপনি।'

'হোমস, মাই ডিয়ার হোমস।' অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে বললেন চ্যালেঞ্জার। 'প্রায় সেই অবস্থাই হতে বসেছিল আজ সকালে— তাই পালিয়ে এলাম।'

স্থির চোখে চেয়ে হোমস বললে, 'খুলে বলুন।'

'আমরা তিনজনেই এখানে বুদ্ধিমান— কম বেশি।' বলে একটু থামলেন। কারও আপত্তি নেই দেখে ফের বললেন, 'কিন্তু আমাদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান বলে মঙ্গলগ্রহীরা আমাকেই চিনে রেখেছে— কারণ, আমিই এতদিন ধরে তাদের দেখেছি ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে। তারাও দেখেছে আমাকে।'

'ঠিক কথা,' হোমস সায় দিতে আত্মগর্বে আরও স্ফীত হলেন প্রফেসর।

বললেন, 'তাই ঠিক করলাম আজ ভোর রাতে একটা এক্সপেরিমেন্ট করা যাক। লুকোচুরি খেলায় ওদের একজনকে আমার বাড়িতেই সেদিন হারিয়ে দিয়েছি। কাল রাতে রিজেন্ট স্ট্রিটে আলো জ্বালিয়ে মানুষ তোলার দৃশ্যও দেখেছি—'

'আমিও দেখেছি,' ফ্যাকাশে মুখে বলল ওয়াটসন, 'কিন্তু কেন প্রফেসর?'

অনুকম্পার চোখে তাকিয়ে প্রফেসর বললেন, 'খাবার জন্যে। আমাদের শিরায় আর ধমনীতে নল ঢুকিয়ে রক্ত টেনে নিয়ে ওরা নিজেদের শরীর চাঙ্গা রাখে— ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে সে দৃশ্যও আমি দেখেছি।— ওকী! হোমস, তোমার বন্ধু অজ্ঞান হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।— হবে না? তাহলে দয়া করে ডাক্তার, আমার কথার মাঝে অমন করে আঁতকে উঠো না। আজ সকালে ঠিক করলাম ওদের চেনা দিয়ে দেখি কী করে।'

'তারপর?' গম্ভীর হয়ে গেল হোমস।

'মাথায় কালো কাপড় চাপা দিয়ে চেয়ে রইলাম ক্রিস্টালের দিকে। যন্ত্রটা ওদের। লন্ডনেই কোথাও আছে, সে খবরও রাখে। তাই কিছুক্ষণ ওদের নররক্ত পানের দৃশ্য দেখবার পর হঠাৎ একজন সটান চাইল আমার চোখের দিকে।'

ওয়াটসন নিশ্চুপ। হোমস পাইপ ধরিয়ে নিল দেশলাই জ্বালিয়ে।

প্রফেসর বললেন, 'ব্যাটাচ্ছেলে অনেকক্ষণ ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর ক্রিস্টাল অন্ধকার হয়ে গেল। আমিও গতিক সুবিধের নয় বুঝে এই টিনের বাক্সে ক্রিস্টালটাকে রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। আধ মিনিটও গেল না— দুটো মোড় পেরোতে না পেরোতেই এনমোর পার্কের বাড়ির সামনে হাজির হল একটা তেপায়া যন্ত্র। দূর থেকেই শুনলাম ভাঙাচোরার শব্দ। তছনছ করে ক্রিস্টাল খুঁজছে। না পেয়ে এতক্ষণে বোধহয় বাড়িটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়েও দিয়েছে। আমি আর ওমুখো হচ্ছি না।'

কাষ্ঠ হেসে হোমস বললে, 'ওদের চোখে আপনি তাহলে আসামি।'

'আসামি না কচু!' হুংকার ছেড়ে বললেন চ্যালেঞ্জার, 'ওদের ক্রিস্টালটা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাকে। কিন্তু ক্রিস্টাল তো এইখানে—'

বলে, টিনের বাক্সটা তুলে টেবিলের ওপর রাখলেন প্রফেসর।
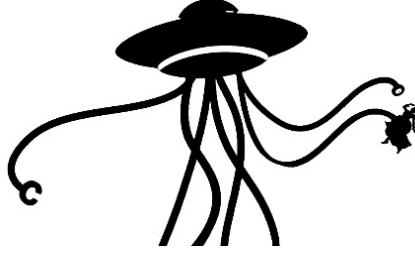
ভিনগ্রহীরা কি মঙ্গলের জীব?

আঁতকে উঠল ওয়াটসন, 'আ-আপনি ক্রিস্টালকে মাঠে ময়দানে ফেলে এলে পারতেন।'

'কেন ডাক্তার?' দুই ভুরু নাচিয়ে বললেন প্রফেসর।

'ক্রিস্টালের পেছন পেছন এখানেও তো আসতে পারে।'

'আসতে পারে কি ডাক্তার, আসবেই।'

ওয়াটসন প্রায় লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে।

সাদা দাঁত বার করে হাসলেন প্রফেসর।

বললেন, 'মাভৈঃ। এই বাক্সের বাইরেটা টিনের— ভেতরে সিসের পাত আছে। না থাকলে আমার পেছন পেছন ওরা এখানে এসে যেত এতক্ষণে।'

'সিসের পাত!'

'হ্যাঁ। যাতে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বা বিকিরণ যোগাযোগে ব্যাঘাত ঘটে। এর ফলেই হানাদার ব্যাটাচ্ছেলে দিশেহারা হয়ে গেছে, আমার টিকি ধরতে পারেনি।'

'অ!' আশ্বস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করল ওয়াটসন।

চ্যালেঞ্জার ফের বললেন, 'কিন্তু ওদের সঙ্গে একটা মোকাবিলা দরকার। মেশিনের সঙ্গে নয়— জ্যান্ত হানাদারের সঙ্গে। ক্রিস্টাল এনেছি সেই কারণেই। হোমস, বুঝেছ, কী বলতে চাই?'

'বিলক্ষণ,' মুচকি হাসল হোমস, 'এক ব্যাটাকে জ্যান্ত ধরতে চান। এই তো?'

'রাইট। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা মঙ্গলগ্রহ থেকে এলেও মঙ্গলের জীব নয়।'

'সে বিশ্বাস আমারও আছে, এতদিন প্রকাশ করিনি।' সায় দিল হোমস।

'আমি জানতাম, তোমার বুদ্ধিমত্তা আমার চাইতে খুব একটা নিরেস না হলেও এ ধাঁধার জবাব বার করবেই। সন্দেহটা হল সেইদিন, যেদিন দেখলাম ওরা মঙ্গলের পাতলা বাতাসে

ভারী দেহ নিয়ে আস্তে আস্তে চলাফেরা করছে। মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ করা ওখানকার জীবদের দেহের ওজনও সেই অনুপাতে কম হওয়া উচিত। কিন্তু তা নয়। মেশিনগুলো দেখেও মনে হল নকল অক্সিজেনের কারখানা। আসলে ওরা অন্য গ্রহের জীব। মঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছিল ওখান থেকে পৃথিবী লক্ষ করে মহাকাশযান ছুড়তে সুবিধে হবে বলে। কেননা, মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ কম।'

'এগজ্যাক্টলি!' সায় দিল হোমস।'

'মঙ্গল থেকেই ক্রিস্টালটাকে ওরা বহুদিন আগে যেভাবেই হোক পৃথিবীতে পাঠায় তার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর হালচাল পর্যবেক্ষণ করার জন্যে। করেওছে। সেইসঙ্গে করেছি আমরা — ওদের হালচাল।' বলে বুক ফুলিয়ে কালো চাপ দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, 'আমি, এই সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, ওদের গ্রহের আকাশ দেখেছি, গ্রহের চেহারা দেখেছি, দেখে গ্রহবাসীদের চেহারা কীরকমটা হওয়া উচিত, তা আঁচ করে নিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে ওরা এসেছে সৌরজগতের বাইরের এমন কোনও গ্রহ থেকে, যেখানে এবং যেখানকার ধারেকাছের গ্রহে মানুষের মতো দু-পেয়ে জীব নেই— আছে তেপায়া জীব। তাই ওরা তেপায়া মেশিনের কল্পনা করতে পেরেছে— চাকাওলা গাড়ির কথা ভাবতেও পারেনি— যা এই পৃথিবীর সভ্যতাকে একলাফে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেকখানি।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান,' বাধা দিয়ে বললে ডাক্তার ওয়াটসন, 'একেবারেই সৌরজগতের বাইরে চলে যাচ্ছেন কী হিসেবে?'

'কারণটা খুলেই বলা হয়েছে, বৎস ডাক্তার। মঙ্গলের আকাশে ডবল চাঁদ দেখেছি, বৃহস্পতি আর শনিগ্রহেও একাধিক চাঁদ আছে। কিন্তু সেসব গ্রহের আকাশ মেঘে ঢাকা— পৃথিবী পর্যবেক্ষণের অসুবিধে। কিন্তু মঙ্গল থেকে পৃথিবীকে দেখতে অনেক সুবিধে। ওদের সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত— বহু বছর আগে থেকেই যদি দেখত তাহলে দু-পেয়ে অথবা চাকাওলা মেশিন উদ্ভাবন করত। কিন্তু তা করেনি। অন্যগ্রহে তিনপেয়ে মেশিন বানিয়ে অভ্যস্ত বলেই মঙ্গলের বুকে ঘাঁটি গেড়ে তিনপেয়ে মেশিনই বানিয়েছে।'

ধমক খেয়ে মিনমিন করে ওয়াটসন বললে, 'কিন্তু পৃথিবী গ্রহেও ক্যাঙারু নিজেদের লেজ ব্যবহার করে তৃতীয় পায়ের মতো।'

'কিন্তু তারা উন্নত জীব নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক সরীসৃপও ইয়া মোটা ল্যাজ ব্যবহার করত ঠেকনা হিসেবে ভারী শরীরটাকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে। কিন্তু তেপায়া জীব এ পৃথিবীতে কোথাও নেই— বিবর্তন সেভাবে ঘটেনি। ঘটেছে অনেক দূরে সৌরজগতের বাইরে কোথাও। অক্টোপাসের মতো এই জীবরা গ্রহে গ্রহে বিজয়কেতন উড়িয়ে পৃথিবীগ্রহ বিজয়ের স্বপ্নও দেখেছিল মঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে। বন্ধুগণ, ওদের সেই অভিযান ভন্ডুল করবার জন্যেই জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার এই ক্রিস্টাল নিয়ে পালিয়ে এসেছে এইখানে।'

ওয়াটসন কারও আত্মম্ভরিতা একদম সইতে পারে না। বাঁকা সুরে বললে, 'পালিয়ে এসে অভিযান ভন্ডুল করতে চান করুন। কিন্তু অক্টোপাসের মতো চেহারা যাদের, তাদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।'

'মাই ডিয়ার ডাক্তার,' বিনয়ক্ষরিত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটও রণক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করে পরে বিজয়ী হয়েছিলেন। ইতিহাসে এমন নজির ভুরি ভুরি আছে। আর অক্টোপাসের মতো চেহারা যাদের বলছ, তাদের ব্রেন নেই একথা ভুলেও মনে করবে না। যেমন জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জারের চেহারাটা গরিলার মতো— কিন্তু সুপার ব্রেনের অধিকারী সে। ঠিক তেমনি আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওদের ওই থলথলে দেহটা আসলে পুরোপুরিই ব্রেন। লিকলিকে শুঁড়গুলোর কাজ কেবল যন্ত্রপাতি নির্মাণ আর চালনা করা। গতর খাটানোর দরকার হয় না বলেই গতর বড় হয়নি— ব্রেন খাটিয়ে ব্রেনটাই কেবল বড় করেছে, পৃথিবীর সব বড় বৈজ্ঞানিকই যা করেন।'

ওয়াটসন বিরক্তি গোপন করে বললে, 'এঁকে দেখাতে পারেন একটা জীবকে? আমার দেখার সৌভাগ্য এখনও হয়নি।'

'নিশ্চয় দেখাতে পারি। তারপর জ্যান্ত একজনকেও দেখাব—' বলে দাড়ির ফাঁক দিয়ে মুচকি হেসে হোমসের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে নিয়ে খাতা পেনসিল টেনে নিয়ে ঝপাঝপ একটা কিম্ভূতকিমাকার জীবের ছবি এঁকে ফেললেন— যার মুখবিবর ত্রিভুজের মতো, চোখ ভাঁটার মতো, মুখবিবরের দু-পাশ দিয়ে ঝুলছে কতকগুলো লিকলিকে শুঁড়। বাদবাকি শরীরটা ভিস্তিওয়ালার জলভরতি চামড়ার থলির মতো বিপুল।

প্রফেসর বললেন, 'পেছনে দুটো ফুটো আছে— নিশ্চয় কান। কান আর চোখ নিশ্চয় কারও ধড়ে লাগানো থাকে না— ব্রেনের লাগোয়া হয়। তাহলে পুরো থলথলে বস্তুটাই কি

ব্রেন নয়?’

ঢোঁক গিলল ওয়াটসন। যুক্তি অকাট্য, নির্বাক থাকাই শ্রেয়।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার টিনের বাক্সে হাত দিয়ে বললেন, ‘ডাক্তার, ক্রিস্টালটা তোমার দেখা দরকার। পৃথিবীতে এমন জিনিস আজ পর্যন্ত কেউ কল্পনাও করতে পারেনি— আবিষ্কার করা তো দূরের কথা। টেলিগ্রাফ যন্ত্রে যেমন তারের মধ্যে দিয়ে খবর ছুটে যায়, এই ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে ইথারের মধ্যে দিয়ে ছবি ভেসে যায়। বলতে পারো গ্রহে গ্রহে যোগাযোগের টেলিভিশন।’

‘ক্রিস্টালভিশন।’ টিপ্পনী কাটল শার্লক হোমস।

‘হোমস,’ এতক্ষণে যেন হোমসের কথা মনে পড়ল চ্যালেঞ্জারের, ‘ক্রিস্টাল এবার বের করব, মক্কেলকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসব— তারপর হারামজাদাকে আস্ত ধরবার কী প্ল্যান তুমি এঁটেছ বলো।’

উঠে দাঁড়িয়ে ম্যান্টলপিস থেকে মরক্কো চামড়ার ব্যাগ বার করল হোমস। বার করল সিরিঞ্জ আর মরফিনের শিশি।

‘হোমস!’ আঁতকে উঠল ওয়াটসন, ‘বারো বছর ছেড়ে দেওয়ার পর আবার?’

ধীর কণ্ঠে হোমস শুধু বললে, ‘আমার জন্যে নয়, ওয়াটসন। মানুষের রক্ত যারা নিজেদের রক্তে মিশোয়, তাদের রক্তে এই মাদক দ্রব্যটি মিশিয়ে দেখতে চাই মানুষের মতোই ঝিমিয়ে পড়ে কি না।’

‘হোমস?’ সটান উঠে দাঁড়াল ওয়াটসন।

চ্যালেঞ্জার ততক্ষণে বাক্সর ঢাকনি খুলে ক্রিস্টাল বার করে ফেলেছেন। ডিমের মতো গড়ন, কিন্তু মুঠির মতো বড়। অনুজ্জ্বল নীলাভ দীপ্তি কুণ্ডলী পাকাচ্ছে ভেতরে। কালো কাপড় দিয়ে নিজের মাথা ঢেকে হোমসকে ডাকলেন প্রফেসর। ওয়াটসনও ক্রিস্টাল দৃশ্য দেখবার লোভ সামলাতে না পেরে মাথা গলাল কালো কাপড়ের তলদেশে। অমনি দেখল নীলাভ কুয়াশা সরে যাচ্ছে। সহসা স্পষ্ট দেখা গেল দুটো ড্যাবডেবে চোখ নিষ্পলকে চেয়ে আছে। আশপাশে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত যন্ত্রপাতি।

বিড় বিড় করে বললেন প্রফেসর, ‘চললাম মেশিনের কন্ট্রোল রুমে। এই ক্রিস্টালের জুড়ি ক্রিস্টাল নিয়ে বসে আছে শয়তান। জুড়ির খোঁজে টহল দিচ্ছে। এল বলে এক্ষুনি।’

বলতে না বলতেই অন্ধকার হয়ে গেল ক্রিস্টাল। কালো কাপড় ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রফেসরও উঠে দাঁড়ালেন তক্ষুনি। ঢাকনি খোলা বাক্সের মধ্যে ক্রিস্টাল রেখে বাক্স রাখলেন খোলা জানলার সামনে টুলের ওপর।

বললেন হৃষ্ট কণ্ঠে, 'শুধু ঢাকনিটা খোলা রইল— তার মানে ঘরের কড়িকাঠটুকুই কেবল দেখতে পাবে ভিনগ্রহী— আমাদের নয়। ডাক্তার তুমি বড় ভয় পেয়েছ— ঘরের ওই কোণে দাঁড়াও। হোমস, তুমি সিরিঞ্জ নিয়ে জানলার এপাশে দাঁড়াও। আমি দাঁড়াচ্ছি ওপাশে।'

কথা শেষ হতে না হতেই ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ শোনা গেল অনেক দূরে। এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো দ্রুত ছন্দে নয়— অনেকটা ধীর গতিতে।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হোমস বললে, 'এসে গেছে।'

রাস্তার মোড়ে দেখা গেল একটা ফাইটিং মেশিনকে। প্রতি পদক্ষেপে ভক্ ভক্ করে সবুজ বাষ্প ঠিকরে বেরোচ্ছে সন্ধির জায়গাগুলো দিয়ে। বয়লার বপুর চারপাশ দিয়ে ঠিকরোচ্ছে সবুজ বাষ্প। তিনটে পা ফেলে অদ্ভুত বিকট কায়দায় এগিয়ে আসছে বেকার স্ট্রিট দিয়ে।

সরে এল হোমস। ফাইটিং মেশিনের চলন ভঙ্গিমায় সেই তেজ আর নেই। পুরো যন্ত্রটাই যেন নিস্তেজ নির্বীর্য।

জানলার সামনে এসে গেছে মেশিন। হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছে রাস্তার ওপর। লক্ষ ভোমরার ডাকের মতো আশ্চর্য একটা গুনগুন গুনগুন আওয়াজে কানে যেন তালা লেগে যাচ্ছে। জুনের ঝকঝকে রোদ ঢাকা পড়ে গেল সহসা। জানলা জুড়ে বয়লার বপু হেলান দিয়ে রয়েছে দেওয়ালে। খটাং খট শব্দে কী যেন খুলে গেল।

জানলার গোবরাটে সপাৎ করে আছড়ে পড়ল একটা শুঁড়। তারপর আর একটা। ধাতুর তৈরি শুঁড় নয়— প্রাণীদেহের শুঁড়। সেইসঙ্গে শোনা গেল হাপরের মতো শব্দে নিশ্বাস নেওয়ার কষ্টকর শব্দ! হু-উ-উ-স হু-উ-উ-স শব্দে আওয়াজ করতে করতে আরও দুটো শুঁড় এসে পড়ল গোবরাটে। তারপর পিছলে এল একটা থলথলে চামড়ার দেহ। গোবরাট পেরোতে যেন প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। শুঁড় দিয়ে অনেক কসরত করে ভারী দেহটাকে নিয়ে এল গোবরাটের ওপর। তারপর ধপাস করে পড়ল ঘরের মেঝেতে। আয়তনে ঠিক যেন বড় ভালুক।

চক্ষের নিমেষে চ্যালেঞ্জার ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় কালচে একজোড়া গোল চোখ ফিরল প্রফেসরের পানে; একজোড়া শুঁড় পাকসাট দিয়ে বসে গেল গলার ওপর।

দম আটকে গেল চ্যালেঞ্জারের। গরিলা শক্তি নিয়েও নিজেকে ছাড়াতে পারলেন না শুঁড়ের পাকসাট থেকে। ঠেলে বেরিয়ে এল দুই চোখ। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'হোমস... কুইক!'

হোমস তার আগেই অবশ্য ধেয়ে এসেছে। আগন্তুকের দুই চোখ চ্যালেঞ্জারের ওপর নিবদ্ধ থাকায় দেখতে পায়নি হোমসকে। চক্ষের নিমেষে সিরিঞ্জের ছুঁচ ঢুকিয়ে দিল ড্যাবডেবে দু-চোখের ঠিক নীচে থলথলে চামড়ায়। শূন্য সিরিঞ্জ শিশিতে ডুবিয়ে ভরতি করে নিয়ে আবার ফুঁড়ে দিল একই জায়গায়।

থরথর করে কেঁপে উঠল আগন্তুকের প্রত্যঙ্গগুলো। তারপর একটু একটু করে নিস্তেজ হয়ে ঝুলে পড়ল চ্যালেঞ্জারের কণ্ঠদেশ থেকে। হাপরের আওয়াজের মতো নিশ্বাসের শব্দটাও এল কমে। মৃদু ছন্দে স্পন্দিত হতে লাগল থলথলে কলেবর।

গলায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রফেসর বললেন, 'ধন্যবাদ, হোমস!'

ঘরের কোণ ছেড়ে এগিয়ে এসে ওয়াটসন বললে, 'পচা গন্ধটা কীসের, হোমস?'

'এর গা থেকে বেরোচ্ছে। চামড়ায় পচন ধরেছে।' বললে হোমস।

একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওয়াটসন। ডাক্তারি চোখে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর বললে, 'মরফিন দিয়ে তুমি ওর যন্ত্রণা কমিয়ে দিলে। বেচারা! মরতে বসেছিল, একেবারে মেরেই ফেললে। ওই দেখো, ফুসফুস আর কাজ করছে না।'

'বেচারা!' ছাদ কাঁপিয়ে হুংকার ছাড়লেন চ্যালেঞ্জার, 'কাকে বেচারা বলছেন? মানুষের শরীরে জীবাণু আছে— আকাশে বাতাসে জলেও আছে। মানুষ সেই জীবাণু শত্রুকেই বন্ধু করে নিয়ে ঘরসংসার করে এসেছে এই পৃথিবীতে। সেই মানুষের রক্তই এই শয়তান পান করেছে। ওকে বেচারা বলছ?'

হোমস বললে, 'চ্যালেঞ্জার ঠিকই বলেছেন, ওয়াটসন। নররক্ত অতিশয় সুস্বাদু ওদের কাছে। তাই নির্বিচারে মানুষ বধ করেছে। কিন্তু মানুষের দেহে বাসা বাঁধা জীবাণুরা অদৃশ্য বলেই যে নিরীহ, তা তো নয়। ওরা যেসব গ্রহে বিজয় কেতন উড়িয়ে এসেছে অদৃশ্য

জীবাণুরা নিশ্চয় এইভাবে সেসব গ্রহ পাহারা দেয় না। তাই পার পেয়ে গেছে। তাই ঘায়েল হল সবুজ সুন্দর, এই পৃথিবীতে এসে।'

চ্যালেঞ্জার বললেন, 'বক্তিমে পরে দিও, হোমস। লাশটাকে অ্যালকোহলে ডুবিয়ে জিইয়ে রাখা দরকার গবেষণার খাতিরে। বড় চৌবাচ্চা আছে বাড়িতে?'

'আছে, আর দোকানে দোকানে আছে অনেক মদ। ওয়াটসন হাত লাগাও। লাশটাকে নীচে নিয়ে যাওয়া যাক।'

এইচ. জি ওয়েলসের লেখা 'ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস' যারা পড়েছ, এর পরের ঘটনা তারা জানো। কিন্তু যে কাহিনি ওয়েলস সাহেব লিখে যাননি— তা-ই নিয়েই এই চমকপ্রদ কাহিনি শেষ করছি।

লাশটাকে হেঁইও হেঁইও করে তিনজনে নামিয়ে নিয়ে গেল একতলায়, ন-ফুট লম্বা, চারফুট চওড়া আর তিনফুট গভীর একটা শুকনো চৌবাচ্চা ছিল সেখানে! দড়ি দিয়ে বেঁধে গুরুভার লাশটাকে টেনে সেই চৌবাচ্চায় ফেলার পর, হাঁপাতে হাঁপাতে চ্যালেঞ্জার বললেন, 'কী! বলেছিলাম-না মঙ্গলের জীব এরা নয়? ফুসফুসটার নিশ্বাস নেওয়ার আওয়াজ শুনেই বুঝেছিলাম— অতবড় ফুসফুস মঙ্গলের পাতলা হাওয়ার উপযুক্ত নয়। এ প্রাণী এমন কোনও গ্রহের, যেখানকার মাধ্যাকর্ষণ বেশি। তাই যেমন ওজন, তেমনি জোর। মরবার সময়েও ব্যাটাচ্ছেলে টুঁটি জড়িয়ে ধরে হাড়েহাড়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।'

হোমস বললে, 'বুঝেছি। এবার দরকার মদ। চলুন, রাস্তার দোকান থেকে নিয়ে আসি।'

বেকার স্ট্রিটেই মদের দোকান ছিল। কয়েক পিপে মদ গড়িয়ে এনে ঢেলে দেওয়া হল চৌবাচ্চায়। তারপর হাত মুছে প্রফেসর উঠে এলেন দোতলায়। খোলা জানলা দিয়ে দেওয়ালের গায়ে হেলান দেওয়া ফাইটিং মেশিনের খোলা হ্যাচের মধ্যে দিয়ে ঢুকলেন ভেতরে। ওয়াটসন আর হোমস বাইরে দাঁড়িয়েই দেখল ভেতরকার রাশিরাশি সূক্ষ্ম কলকবজা। প্রফেসর অনেকক্ষণ এটা-ওটা নাড়াচাড়া করার পর একটিমাত্র জিনিস হাতে ঝুলিয়ে এলেন বাইরে।

জিনিসটা একটা ডিম্বাকৃতি ক্রিস্টাল— অবিকল আগেরটার মতোই, শুধু যা একটা ধাতব বাক্সের খুপরিতে বসানো এবং অনেকগুলো তার ঝুলছে বাক্সটার চারদিক থেকে।

জানলার গোবরাট টপকে ধপাস করে ঘরে লাফিয়ে পড়ে দন্ত বিকশিত করলেন প্রফেসর, ‘এই বস্তুটাই খুঁজছিলাম।’

‘এ তো দেখছি আমাদের ক্রিস্টালের দোসর।’ বললে শার্লক হোমস।

‘হ্যাঁ, কিন্তু এই তারগুলো দিয়ে অন্যান্য জায়গায় রাখা ক্রিস্টালের ছবিও দেখা যায়।’

‘তার মানে মঙ্গলে এদের ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে এখন?’

‘হ্যাঁ। সেইজন্যই তো আনলাম।’

পৃথিবী আক্রমণের দশম দিনেই হানাদারদের আজব ক্রিস্টাল-ভিশন আবিষ্কৃত হল এইভাবে। বিভিন্ন তারের যোগাযোগ ঘটিয়ে সে ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে হানাদারদের অনেক ঘাঁটির দৃশ্য দেখলেন প্রফেসর, হোমস এবং ওয়াটসন। দেখলেন, প্রিমরোজ হিলের বিরাট গর্তে দলে দলে হানাদার ধুঁকছে রোগযন্ত্রণায়— মুমূর্ষু প্রকৃতই। যন্ত্রপাতিগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চারদিকে। ওঁদের সামনেই হঠাৎ আকাশ থেকে গোঁত খেয়ে বিশাল উড়ন চাকতিটা ঠিকরে পড়ল গর্তের মধ্যে— চালক নিশ্চয় খতম হয়েছে। একতাল সবুজ ধোঁয়া ঠিকরে গেল চাকতির চারদিক থেকে।

ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে এল হানাদারদের দাপানি। লন্ডনের পথেঘাটে পড়ে থাকতে দেখা গেল কুপোকাত মেশিনদার। পৃথিবী বিজয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল যাদের-শুধু-চোখে-দেখা-যায়-না— সেই অদৃশ্য রক্ষী জীবাণুদের পালটা আক্রমণে।

মঙ্গলের ঘাঁটিতে বসে হানাদাররা সে খবর পেয়েছিল আগেই। পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়ে গেল কিন্তু বিচ্ছিন্ন হল না। তারা এসেছিল অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে; উচিত শিক্ষা পেয়ে সে চেষ্টার ধার দিয়েও গেল না। বরং ভয় করতে শিখল পৃথিবীকে এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল পৃথিবীর একটি মস্তিষ্ককে।

নাম, তাঁর প্রফেসর জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। ক্রিস্টাল ভিশনের দৌলতে ধীমান জীবদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ওঁর। ফলে ছবি সংকেতের মধ্যে দিয়ে শুরু হল কথাবার্তা। ছবি-সংকেতের মধ্যে দিয়েই তারা বুঝিয়ে দিলে প্রফেসরকে, ধারণা তাঁর অভ্রান্ত। সত্যই তারা সৌরজগতের বাসিন্দা নয়, এসেছে বহু দূরের আর এক নক্ষত্রলোক থেকে। গ্রহে গ্রহে উপনিবেশ স্থাপন করে জ্ঞান বিনিময়ই তাদের লক্ষ্য ছিল। সেই সঙ্গে পৃথিবীতে পেয়েছিল অঢেল খাদ্য, পরে যখন তা প্রমাণিত হল বিষাক্ত— তখন আর পৃথিবীতে তারা পা দেবে না। কিন্তু তাদের জ্ঞানভাণ্ডারের কিছু কিছু দান করে যাবে

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে। যাতে একদিন তিনি নিজেই মহাকাশযান বানিয়ে উড়ে যেতে পারেন তাদের গ্রহে। নীল বিদ্যুতের মন্ত্রগুপ্তিও তারা শিখিয়ে দিয়েছিল প্রফেসরকে। ফাইটিং মেশিনের কন্ট্রোল কেবিনেই পাওয়া গিয়েছিল মটরদানার মতো ছোট্ট একটা ক্রিস্টাল। নীল মোটেই নয়, রক্তবর্ণ। কিন্তু বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ সেই ক্রিস্টালের দিকে ছুটে গেলেই তা থেকে বেরিয়ে আসত প্রলয়ংকর তেজরাশি— যা রিফ্লেকটর দিয়ে ঘুরিয়ে নীল বিদ্যুতের আকারে ফেলা যায়। যে দিকে খুশি— যার স্পর্শমাত্র নদী বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, জাহাজ-বাড়ি-জীবদেহ অঙ্গারে পরিণত হয়। নীল বিদ্যুৎকে সংহত করে ঠিকমতো ফেলতে পারলে পরমাণুকে ভেঙে বিপুল শক্তি তার মধ্যে থেকে বার করে আনা যায়। এই শক্তির দৌলতেই গ্রহে গ্রহে ঘুরে বেড়ায় ওরা। মঙ্গল থেকেও এসেছে পৃথিবীতে, মঙ্গল ওদের অস্থায়ী আস্তানা। সমগ্র সৌরজগত পরিভ্রমণ করে একটিমাত্র ধীমান মস্তিষ্কের সন্ধান ওরা পেয়েছে। সেই মস্তিষ্কটিকেই ওরা দিয়ে যাচ্ছে প্রলয়ংকর পরমাণুর শক্তি নিংড়ে নেওয়ার গুপ্তবিদ্যে, আকাশ-যান নির্মাণের কৌশল এবং টেলিপ্যাথির গোপন রহস্য— যা আয়ত্ত করতে না পারা পর্যন্ত মানুষ ইতর প্রাণীর পর্যায়েই থেকে যাবে।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার রক্তবর্ণ ক্রিস্টালটিকে কোথায় রেখেছেন, কেউ তার হদিশ পাচ্ছে না। তবে ইদানীং একটা গুজব শোনা যাচ্ছে। চ্যালেঞ্জার আজ স্বর্গত ঠিকই, কিন্তু তাঁর গুপ্তবিদ্যে নাকি তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্য বৈজ্ঞানিকদের হাতে চলে গিয়েছে। যে বৈজ্ঞানিকদের উনি বিশ্বাস করতে পারেননি বলেই পৃথিবীধ্বংসী পারমাণবিক শক্তির উৎস জীবদ্দশায় ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানাননি— সেই বৈজ্ঞানিকরাই নাকি পারমাণবিক শক্তির ফরমুলাটা হাত করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর। ফলে, অ্যাটম বোমা উড়িয়ে দিয়েছে হিরোশিমা ও নাগাসাকি। তেজস্ক্রিয়তার বিষে আজ পৃথিবীর জল বাতাস পর্যন্ত বিষিয়ে যাচ্ছে। মানুষ নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে আনছে। এই সেই শক্তি যা সৌরজগতের বাইরে থেকে দান হিসাবে এসেছিল পৃথিবীতে। কে জানে, দানবরা পৃথিবী ধ্বংসেরই সুদূর পরিকল্পনা করেছিল কি না আত্মহননের মধ্য দিয়ে।

কল্পবিশ্বের পুস্তকতালিকা

কল্পবিশ্বের ডিজিট্যাল ইবুক

কল্পবিশ্বের বইগুলি এবার পাবেন ইবুক ফরম্যাটেও। পড়তে পারবেন আপনার মোবাইল, কম্পিউটার, আইফোন, আইপ্যাড কিংবা কিন্ডল ডিভাইসে। বিশদে জানতে নিচের Q.R. Code স্ক্যান করুন।

Google Playbook

Q.R. Code

Amazon Kindle

Q.R. Code